বনবাসী সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ

ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ বিচিত্র সাধনা ও সংস্কৃতির এমনই এক মিলনক্ষেত্র যে এখানে নির্দিষ্ট করে সবসময় বলা কঠিন— কোন গোষ্ঠী অপর কোন গোষ্ঠীর থেকে কতটা নিয়েছে বা কতটা দিয়েছে, কে কার কাছে কতটা ঋণী। বনবাসী সমাজের চিরাচরিত কাঠামো হিন্দু ভারতবর্ষের শ্রেণীবর্ণ বিভাজিত সমাজের থেকে অকেটাই ভিন্ন। তাত্ত্বিকভাবে এই ভিন্নতার কথা বলা হলেও, বৃহত্তর হিন্দু সমাজ সংস্কৃতির বহু কিছু এমনভাবে বনবাসী সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকে গেছে এবং উল্টোদিক দিয়েও এমন একটি প্রবাহ বহমান থেকেছে যে এদের মধ্যে চরম কোনো সীমারেখা টানা দুস্কর। বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ গোবিন্দ সদাশিব ঘুরে বনবাসীদের বলেছিলেন, 'অনগ্রসর হিন্দু'। বাস্তবে বহু বনবাসী গোষ্ঠী তাদের নিজেদের ধর্মের কথা বলতে গিয়ে হিন্দু ধর্মের নামই উল্লেখ করে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বনবাসী গোষ্ঠীর হিন্দু দেবদেবীর উপর যেরকম বিশ্বাস এবং গভীর ভক্তিতে তাদের পূজার্চনা করতে দেখা যায়— তা ভারতীয় সংস্কৃতির এক সমন্বয়ী রূপকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। এই সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।

পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে যে সমস্ত বনবাসী গোষ্ঠীর বাস, তাদের জীবন সংস্কৃতির উপর বহুদিন ধরেই বৈষ্ণব প্রভাবের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। সাঁতাল, ভূমিজ, কোড়া, মাহালি, ওরাঁও, বাইগা, মুণ্ডা, লোধা, শবর— এই সমস্ত বনবাসী জনগোষ্ঠীর কোনোটিই এই প্রভাবের বাইরে যেতে পারেনি। এই অঞ্চলের বনবাসী গৃহের অঙ্গনে তুলসীথান যে পবিত্রতার আসন অধিকার করে আছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। একথা হয়তো ঠিক যে, তারা তুলসীর পৌরাণিক উপাখ্যান জানেন না। কিভাবে দেবী লক্ষ্মী তুলসী হিসেবে জন্ম নিলেন, কিংবা সুদামা অভিশপ্ত হয়ে শঙ্খচূড় দৈত্য হিসেবে জন্মলাভ করলেন। অতঃপর তুলসীর সঙ্গে তার বিবাহ, তুলসীর সতীত্ব হরণ— এসব কাহিনি হয়তো তাদের গোচরে নেই। কিন্তু তুলসীকে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসাতে তাতে কোনো অসুবিধা হয়নি। এই তুলসীর অন্য নাম— বৃন্দা। যার থেকে তীর্থক্ষেত্র বৃন্দাবনের নাম। এই বৃন্দাবনের কথা এসেছে সাঁওতালদের কারাম গানে—

সিরি বৃন্দাবনে করমে কাটাই লো
গোড়াই লোম দেশাই আখোড়া হে
অহিরে সিরি বৃন্দার বন
অহিরে পহরে বাতি হরিনিত নাম হে যাই
ঘড়েতে লাগে গেল ফাঁসি
হরিনিত কাঁদে ভাই বৃন্দারে বনে
হরিনিত কাঁদে ভাই মিজুরে বনে।

শুধু করম বা কারাম গানে নয়; সোহরাই পরবের গানে শোনা যায় শ্রীকৃষ্ণের কথা—

তিরমূর্তি সিরিজিলা
কানুরে গোয়ালা
পুরুকাহি দাহারালি
গাইয়া জো জো রে।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের কথাও শোনা গিয়েছে একটি করম গানে।

বারো যে বৎসর সীতা লঙ্কাগাড়ে রহলোম
লঙ্কার গাড় সীতা কহিস নো গাড় হিয়োরে
বারো যে বৎসর সিতা লঙ্কাগাড়ে রহলোম
সিতা তো সিতাতো গেল অবিন দেশে
সিতাতো সিতাতো গেল অবিন দেশে
আর নাহি পাবি রে রামেরে লক্ষ্মণ
সিতাতো গেল অবিন দেশে

আসলে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বা শ্রীকৃষ্ণের কাহিনির মৌখিক ধারা সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারত ভূখণ্ডে বহমান ছিল। রামের তির-ধনুকধারী রূপ, অশ্বেতকায় গাত্রবর্ণ; কিংবা গোপালক গোষ্ঠীর নেতা বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বনবাসী সমাজের একটি বড় অংশ নিজেদের মিল খুঁজে পেয়েছে। সে কারণে নানা সংযোগ সূত্রে এদের বাঁধতে চেয়েছে আপন সংস্কৃতির সঙ্গে। এখানে যারা বিপ্রতীপ বা অপর ব্যাখ্যায় প্রয়াসী তাদের মত হলো, আদিতে এরা ছিলেন বনবাসী নায়ক— যাদের হিন্দুকরণ ঘটেছে পরবর্তী সময়ে। যেমন, সাঁওতালরা মনে করেন শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে অযোধ্যা পাহাড়ে এসেছিলেন। পাহাড়ের উপরে একটি অনিঃশেষ জলধারা কুণ্ডের আকারে এখনো প্রবহমান, যা সীতাকুণ্ড নামে পরিচিত। এই সীতাকুণ্ড নিয়ে প্রচলিত কাহিনিটি হলো ঃ পরিভ্রমণে ক্লান্ত সপরিবার রামচন্দ্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে রান্নার তোড়জোড় করতে থাকেন। রান্না তো হবে, কিন্তু জলের কোনো বন্দোবস্ত নেই। সীতা অনুরোধ করেন, শ্রীরামচন্দ্র যেন জলের একটা ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি ভূমিতে তির নিক্ষেপ করলে জলধারা উৎসারিত হয়, যা এই সীতাকুণ্ড। অযোধ্যা পাহাড়ে

রাম-সীতার এমন অনেক কাহিনি ছড়িয়ে আছে। পাহাড়ে প্রকাণ্ড সব গাছের বাকলে লেগে থাকা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্ভিদের দেহাবশেষ, যা কিনা সরু চুলের মতো মনে হয়। সেগুলিকে সীতার কেশরাশি বলে মনে করা হয়। এই পাহাড়ে বসবাসকালে সীতা মা যে কেশমার্জন করতেন, তারই চিহ্ন রয়ে গিয়েছে জঙ্গলের গাছে গাছে। অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার উৎসবে গিয়ে দেখেছি বাকলে লেগে থাকা এই সীতার কেশরাশি পবিত্র সামগ্রী হিসেবে বিক্রি হচ্ছে।

দুর্বা ঘাসের জন্ম কাহিনির মধ্যেও রাম-সীতার যোগসূত্র রয়েছে। প্রজাদের অনুরঞ্জনে রামচন্দ্র সীতার অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করেন। অগ্নিপরীক্ষান্তে সীতার যখন পাতাল প্রবেশ ঘটছে, তখন রামচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারেননি। ভূমিতে প্রবিষ্টমানা সীতার কেশাকর্ষণ করে তিনি আটকাতে চেয়েছিলেন সীতার পাতাল প্রবেশ। কিন্তু পারেননি, তাঁর হাতে সীতার কয়েকগুচ্ছ মাত্র কেশ রয়ে যায়। আর এই কেশ থেকেই জন্ম হয় দুর্বাঘাসের।

শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বনবাসী সমাজের এই আকর্ষণ মূলত বৈষ্ণব ভাবধারা সঞ্জাত। বিভিন্ন বনবাসী সমাজেই এই প্রভাবের সাক্ষ্য দেখা যায়। সাঁওতাল সমাজে এর খুব স্পষ্ট পরিচয় বহন করেন 'গোঁসাই এরা' দেবী। 'এরা' শব্দের অর্থ স্ত্রী। সাঁওতালদের পবিত্র জাহেরথানে গোঁসাই এরা পূজা পান। কিন্তু গোঁসাই-এর স্ত্রী কীভাবে সাঁওতাল দেবী মণ্ডলীতে স্থান পেলেন। অধিকাংশ স্থানে বা লিখিত বিবরণীতে এর কোনো সদুত্তর আমি পাইনি। কিন্তু এ বিষয়ে একটি কাহিনি আমি শুনেছিলাম, বীরভূম জেলার রাজনগরে ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন একটি সাঁওতাল গ্রামের প্রধান বা মাঝির কাছ থেকে। কাহিনির সারাৎসার হলো, একদা গোঁসাই পরিবারের এক বিবাহিতা রমণী জঙ্গলে পথভ্রষ্টা হয়ে লাঞ্ছনার শিকার হন। সে সময় সাঁওতালদের কয়েক ভাই মিলে তাকে রক্ষা করে বাড়িতে আশ্রয় দেন। রমণীটিকে বাড়িতে নিয়ে আসার সময় কতকগুলি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা তাদের মাথায় চাড়া দেয়। প্রথমত, রমণীটিকে একা পেয়ে আবার যদি কেউ লাঞ্ছনা করে। দ্বিতীয়ত, রমণীটিকে কেন্দ্র করে যদি ভাইদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাঁধে। তার চেয়ে রমণীটিকে পূজ্য আসনে বসিয়ে সম্মান করলে তাঁর সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। এভাবেই গোঁসাই এরা হিসেবে পরিগণিত হন বৈষ্ণব রমণীটি। এই কাহিনি একই সঙ্গে বনবাসী সমাজের মানুষদের উদারতা, মহত্ত এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় বহন করে।

এই কাহিনির অন্য ব্যাখ্যাও হতে পারে। শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী সময়ে ঝাড়খণ্ডে বৈষ্ণব প্রভাব বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমতাবস্থায় বনবাসী সমাজকে এই প্রাবল্যের সামনে কিছুটা সমঝোতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

ঝারিখণ্ডে স্থাবর জাঙ্গম হয় যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া প্রেমে কৈল উন্মত্ত।।
যেই গ্রাম দিয়া যায় যাঁরা করি স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণ ভক্তি।।

এই কৃষ্ণ ভক্তি নানা রূপে বনবাসী জীবন ও সংস্কৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল। পণ্ডিতরা বলছেন, সাঁওতালদের করম গোঁসাই-এর ধারণা শ্রীকৃষ্ণের রূপের সঙ্গে অভিন্ন। আর মুণ্ডাদের করম গানও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক। এই গানই আবার পাঁচপরগনা অঞ্চলে ভাদরিয়া গীত নামে প্রচলিত। সাঁওতাল, মুণ্ডা ছাড়াও সংলগ্ন অচলের জুয়াংদের মধ্যেও বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষণীয়। তারা বলেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাদের মধ্যে এসেছিলেন। প্রথিতযশা নৃবিজ্ঞানী নির্মলকুমার বসুর লেখায় আছে, জুয়াংরা মহাপ্রভুকে ফল দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাদের কাছে মাধব। মাধবকে লেবু খাওয়ানোর কথা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক একটি গানে রয়েছে, যা অধ্যাপক সুহৃদকুমার ভৌমিক উল্লেখ করেছেন। গানটি হল—

টাবাকি নারেঙ্গা বেন্টই টরমর।
বেলে, মাধবরে। সে টুপা খাইলে মধুর।।

রসে টুইটম্বুর লেবু স্বাদ, মাধব খেয়ে দেখ, অত্যন্ত মধুর লাগবে।

বস্তুত রাম ও কৃষ্ণকথার রসমাধুর্য সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সভ্যতায় প্রবাহিত রয়েছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ গোষ্ঠী নির্বিশেষে। বনবাসী সমাজও এই প্রবাহে অবগাহন করে স্বাদ নিয়েছে মাধুর্যের। ■

মহিষাসুর নির্ণাশী

প্রবাল চক্রবর্তী

অর্ধগোলাকৃতি একটা চাঁদ জঙ্গলে চাঁদোয়া ছাড়িয়ে উঁকি মারলো এইমাত্র। তার সঙ্গেই পরিবেশটা বেমালুম বদলে গেল।

একটি তন্বী খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, এবড়োখেবড়ো বন্ধুর বনাঞ্চলের আঁকেবাঁকে। সে তটিনীর জলে তনুময় চাঁদের গুঁড়ো ভাসছে ছলাৎ ছলাৎ। পশ্চিমপাড়ে অনতিউচ্চ নীল পাহাড়ের সারি। পূর্বপাড়ে ঘন বনানী। তবে তারা কেউই নদীর ঘাড়ে এসে পড়েনি। দুই পাড়ে সংকীর্ণ চারণক্ষেত্র পাহাড় ও বনানীর সঙ্গে নদীর ন্যূনতম ব্যবধান রচনা করেছে।

পূর্বপাড়ের আদিম সেই বনভূমিতে আকাশছোঁয়া উঁচু গাছের ভিড়। সেখানে গাছের গুঁড়ি ঘন শ্যাওলায় ঢাকা, গা-ধাক্কাধাক্কি ভিড়ে পথ চলা দায়। গাছ থেকে গাছে লতাগুল্মের নিগূঢ় বন্ধন। বাতাসে শ্যাওলার গন্ধে মিশে আছে মিষ্টি ঝাঁঝালো কদম্বফুলের গন্ধ। বিস্তৃত এই বনানী খ্যাত তার বাসিন্দা হিংস্র পশুদের জন্য। বিশেষত চিতাদের জন্য। শুধুমাত্র চিতার মতো সাহসী যাদের হৃদয়, সেই মানুষরাই এই অটবিব্যূহে ঢোকার সাহস রাখে। জঙ্গলের এক উঁচু গাছের মগডালে আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল দুর্গা। হাতে কলাপাতায় মোড়া একহাত লম্বা একটা পিঠে। নারকেল কোরা, ক্ষীর ও গুড়ের পুর ভরা।

দুর্গার দৃষ্টি নিবদ্ধ দূরে পশ্চিমে নীলপাহাড়ের সারির দিকে। ওখানেই ব্রঙ্গারাজ্যের সীমান্ত। ওপারে মহিষের এলাকা। অসুরদের ব্রঙ্গা থেকে উচ্ছেদ করার পর ক'দিন রাজ্যজুড়ে চলেছে চরম বিশৃঙ্খলা। খানিকটা হলেও পরিস্থিতি এখন উন্নতির পথে। তাই এই একটা দিনের অবকাশ। কিন্তু সে অবকাশও ভারাক্রান্ত হয়ে আছে একরাশ চিন্তায়। একরাশ দ্বিধায়।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মহিষকে এই ব্রঙ্গাভূমি থেকে উচ্ছেদ করে তবেই আবার পুঁথিপত্রে হাত দেব। তা, সেই লক্ষ্য তো পূরণ হয়ে গেছে। তাহলে কি এখন গুরুকুলে ফিরে গিয়ে লেখাপড়া শুরু করবো?

আর ওরা? ওদেরও কি বলবো, নিজেদের পূর্বজীবনে ফিরে যেতে? সেটাই তো ঠিক কাজ হবে, তাই না?

কিন্তু... পলাতক শত্রুকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। লোকে বলে, আগুন, ঋণ ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

কিন্তু... সমরশাস্ত্র বলে, শত্রুকে তখনই আক্রমণ করতে হয়, যখন আমার শক্তি শত্রুর থেকে অনেক বেশি। বাস্তব পরিস্থিতি এখন সেরকমটা মোটেই নয়। তাই যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রয়োজন মহিষের শক্তিক্ষয়, অথবা আমাদের শক্তিবৃদ্ধি, অথবা দুটোই।

কীভাবে হবে সেটা?

মহিষ তো ওখনেই রয়েছে, ওই পাহাড়গুলোর ওপরে, তাই না? ওখানে ঘাপটি মেরে বসে কী করছে? নতুন করে দল পাকাচ্ছে? নতুন কোনও ষড়যন্ত্র করছে? আবার ব্রঙ্গা আক্রমণের তোড়জোড় করছে নাকি? মহিষের আক্রমণের প্রতীক্ষা না করে, আগেভাগেই মহিষকে আক্রমণ করা উচিত, তাই না? সমরশাস্ত্র তো তাই বলে।

কিন্তু... আবার আরেকটা যুদ্ধ? তার জন্য যে অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য বা রসদ দরকার, তা পাবো কোত্থেকে?

রাজকুমার দিব্যবল আমাকে সমর্থন করবে। রাজ্যাভিষেকের পর ব্রঙ্গার সেনাবাহিনী দিব্যবলের সম্পূর্ণ অধীনে এসে যাবে।

কিন্তু... ব্রঙ্গার সেনাবাহিনী কি যথেষ্ট, মহিষকে তার নিজের এলাকায় যুদ্ধে হারানোর জন্য? ব্রঙ্গাসেনা নৌযুদ্ধে পটু। এ যুদ্ধ তো হবে বন্ধুর মালভূমিতে।

আমি কি বেশি ভেবে ফেলছি? এসব ভাবা কি আদৌ আমার দায়িত্ব? হয়তো আমার যা করার তা করা হয়ে গিয়েছে। এবার অন্য কেউ দায়িত্ব নেবে। আমি গুরুকুলে ফিরে যাব। যুদ্ধ করতে মোটেই ভালো লাগে না আমার।

কিন্তু... এই যে এত দুঃখী অনাথ হতভাগ্য মানুষ, যারা আমাকে মা বলে ডাকে, তাদের কী হবে? সন্তানকে রক্ষা করতে মা যুগে যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রতিটি মা। জীবনের প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে। আমার তাহলে কী কর্তব্য?

পিঠেয় অন্যমনস্ক কামড় বসিয়ে আপন চিন্তায় মশগুল ছিল দুর্গা। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল ডাক।

'দুর্গা-আ-আ-আ-আ...'

কে?

'দুর্গা-আ-আ-আ...' আবার শোনা গেল। এবার দুর্গা বুঝতে পারলো, কে ডাকছে। ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি, লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গাছের ডালের ওপর দিয়ে দৌড়তে শুরু করল দুর্গা।

এ জঙ্গলের গাছগুলো এতো কাছাকাছি যে পাশাপাশি গাছের ডালপালাগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। তার ওপর জড়িয়ে গেছে লতাগুল্মর ঝাড়। সবাই মিলে গাছের মধ্যে দিয়ে তৈরি করেছে অসংখ্য বনপথ, মাটির অনেক ওপরে। তারই পথ ধরে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলল দুর্গা। খানিকক্ষণ পরেই দেখতে পেল, দূরে মাতঙ্গী। জঙ্গলের দিকেই এগিয়ে আসছে। চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল দুর্গা। মাতঙ্গী যখন ঠিক ওর নিচে পৌঁছেছে, সিংহনাদের সঙ্গে গাছের ওপর থেকে লাফ দিল দুর্গা, পড়লো গিয়ে মাতঙ্গীর ঠিক পেছনে। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল মাতঙ্গী। কোমর থেকে ছুরি বের করে এক ঝটকায় পেছন ফিরে দেখল, দুর্গা হাসছে। ছুরি কোষবদ্ধ করে কপট ক্রোধে বলল,

'এটা কী হল?'

'হা-হা-হা-হা' দুর্গার উত্তর।

'ঠাট্টা রাখো' বলল মাতঙ্গী, 'সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। কখন আসবে তুমি?'

'কোথায় বসেছো তোমরা?'

‘ওই তো, ওই টিলাটার ওপারে, নদীর ধারে।’

‘চলো, যাওয়া যাক।’

দৌড়তে শুরু করল দুজনে।

রুপোলি আলোর বান ডাকিয়ে বড় একটা চাঁদ উঠেছিল, এই একটু আগে। সেটা দেখে ঘরের প্রদীপটা অবহেলায় নিভিয়ে দিয়েছিলাম। আচমকা মেঘের দল হামলা করল আকাশ জুড়ে, চাঁদটা হল অদৃশ্য। তখন থেকেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকারে অন্ধ চোখদুটো অন্ধকার হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে অবহেলায় পরিত্যক্ত সেই ঘরের প্রদীপটাকে। কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। জীবনটাও তো অবিকল এরকম, তাই না? ভাবছিল আরক্ত। অসুর-ধর্মগুরু আমি, দানববংশীয় আরক্ত। ক'দিন আগে আমি থাকতাম প্রাসাদোপম এক বাড়িতে। পঞ্চব্যঞ্জনে আহার সারতাম। গোটা ব্রঙ্গারাজ্যের সম্ভ্রমের কেন্দ্র ছিলাম আমি। আর আজ? কুঁড়েঘরে ঠাঁই, দিনান্তে খাবার জোটে কী জোটে না। আশ্চর্য কাণ্ড হলো, আজ আমি অনেক বেশি সুখী।

বহুবছর আগেকার কথা। তখন সবে গুরুকুল থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়েছি। অসুধর্ম গ্রহণ করেছি। গুরুকুল থেকে কিছুটা দক্ষিণে নবনির্মিত অসু-উপাসনাগৃহের দায়িত্ব নিয়ে ওখানেই থাকি। সন্নিহিত অঞ্চলের শাসক ছিল যম-উপাসক রাজা নরোত্তম। তার উৎসাহে রাজ্যের যম-মন্দিরগুলি হয়ে উঠেছিল মৃত্যু-সংক্রান্ত যাবতীয় গবেষণা ও জ্ঞানের কেন্দ্র। যম-উপাসক হলেও রাজ্যের প্রতিটি উপাসনাপদ্ধতির ওপরেই সমদর্শী ছিল রাজা। সেই রাজার একমাত্র পুত্র কঠিন এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিল মাসাধিককাল যাবৎ। দিনকে দিন তার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হচ্ছিল। সন্তানের মঙ্গলকামনায় রাজ্যের মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিয়ে বেড়াচ্ছিল রাজা। এসেছিল অসু-মন্দিরেও। পুত্রের সম্ভাব্য মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীত রাজাকে আমি বলেছিলাম, যম নয়, অসুই মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক। অসু তুষ্ট না হলে রাজকুমারের অসুখ ভালো হবে না। আর অসুকে তুষ্ট করার একটাই উপায়, যম-উপাসনা ত্যাগ করে সত্যধর্ম অসুধর্ম গ্রহণ করতে হবে, সপরিবারে। মানেনি রাজা নরোত্তম। তারপর থেকেই রাজকুমারের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি শুরু হয়। দিন কাটে তো রাত কাটে না। শেষমেশ যখন রাজকুমারের শ্বাসকষ্ট শুরু হলো, রাজা নরোত্তম অসুমন্দিরে এসে আত্মসমর্পণ করল। তারপরই যেন জাদুমন্ত্রে ভালো হয়ে গিয়েছিল রাজকুমার। অসুপিতার দিব্যশক্তির এমন সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে নবধর্মে মত্ত রাজা নরোত্তম উত্তরাপথের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে যম-উপাসনার যাবতীয় চিহ্ন মুছে দিয়েছিল। রাজমন্দিরে মৃত্যুর রহস্য সংক্রান্ত বহু পুঁথিপত্র সঞ্চিত ছিল, সেসব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। রাজা কখনোই জানতে পারেনি, রাজবৈদ্য গোপনে অসুধর্ম গ্রহণ করেছিল বেশ কিছুকাল আগে। সেই রাজবৈদ্য ঔষধির নামে স্বল্পমাত্রায় বিষ প্রয়োগ করত রাজকুমারের ওপর, প্রতিদিন। রাজকুমারের অসুস্থতার একমাত্র কারণ ছিল সেই বিষ।

বিগত ক'দশকে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারতবর্ষের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে অসুধর্মে দীক্ষিত করেছি আমি। আজ হঠাৎ সেসবের জন্য বড্ড অনুশোচনা হচ্ছে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ফুলের মতো শিশুদের ওপর বিষ প্রয়োগ করা কি ঠিক হয়েছিল? রাজা নরোত্তমের রাজমন্দিরে যেসব পুঁথি ছিল, তার মধ্যে সঞ্চিত ছিল মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্য। সেগুলোর মূল্য আজ... আজ হঠাৎ করে খুব জানতে ইচ্ছে করছে, মৃত্যুর পরে সত্যিই কী ঘটে। সত্যিই কি অসু স্বর্গদ্বারে প্রতীক্ষা করে আমাদের জন্য? নাকি সম্পূর্ণ অন্যরকম কিছু ঘটে মৃত্যুর পর? জানবার আর উপায় নেই, কারণ সেই জ্ঞান আমি নিজে হাতেই অগ্নিসমর্পণ করেছি।

অসুর-ধর্মগুরু আমি। কশ্যপমুনির গুরুকুলে কাশ্যপপুত্র হিরণ্যকশিপুর প্রিয় ছাত্র ছিলাম আমি। অসুধর্ম প্রচারে প্রাণপাত করেছি। লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার কথায় পূর্বজদের পরম্পরা বিস্মৃত হয়েছে, অসুর নাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু এত বছরের এত সাফল্যের পর মনে হচ্ছে, কোথাও একটা বড় গলদ রয়ে গেছে। একেশ্বরবাদ যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে সেই সত্যিটা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়াতে অন্যায় কোথায়? বলেছিল হিরণ্যকশিপু। তখন যুক্তিটা নিখুঁত মনে হয়েছিল। এখন আর সেটা মনে হচ্ছে না।

আমরা সবসময় ভয়ে মরি, পাছে অসুররা তাদের পূর্বজদের ধর্মবিশ্বাসে ফিরে যায়। সেই ভয়ের নিরাকরণ করতে গিয়ে শুধু তো একেশ্বরবাদ নয়, শুধু তো সৃষ্টিকর্তার একটি নাম নয়, তার সঙ্গে একটা সম্পূর্ণ নতুন জীবনপদ্ধতি চাপিয়ে দিতে হয়েছে মানুষের ওপর। পূর্বের প্রতিটি আচার-আচরণই বিষবৎ বর্জনীয়। এছাড়া আর কোনওভাবে পুরনো উপাসনা পদ্ধতির নেশা ছাড়ানো যাবে না, এমনটাই বলেছিল হিরণ্যকশিপু। কিন্তু তার ফল হয়েছে ভয়ংকর। ধারাবাহিকতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সমাজ থেকে। এই দেশটাকে মহান বানিয়েছে এই দেশের

সভ্যতার ধারাবাহিকতা, তাই না? আগে লোকে ঊর্ধতন চতুর্দশ পুরুষের নাম মনে রাখত। অসুররা আর তা রাখে না। রাখলে তো নিজেদের প্রকৃতিপূজক পূর্বজদের স্মরণ করতে হবে। ফলত অসুররা নিজেদের বংশপরম্পরা সভ্যতা কৃষ্টি সব ভুলে আগাছার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। সাহিত্য ও শিল্পের চর্চা উঠে যাচ্ছে, কারণ সব শিল্পসাহিত্যই তো প্রকৃতিপূজাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। সমাজজীবনে উৎসব পালন উঠে যাচ্ছে, কারণ যেসব উৎসবের সঙ্গে মানুষের নাড়ির যোগ, সেইসব উৎসব প্রকৃতিনির্ভর। নান্দনিকতা ভুলতে বসেছে সমাজ। লক্ষ বছর ধরে গড়ে ওঠা একটা সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করছি আমরা। প্রকৃতিপূজার পরম্পরায় দুষ্ট সবকিছু বাদ দিতে গিয়ে, শেষমেশ সভ্যতার কিছু কি আর বাকি থাকবে? প্রকৃতিপূজকরা প্রকৃতির শক্তির পূজা করতে গিয়ে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে, সমীহ করতে শিখতো। জীবনচক্রে প্রতিটি জীবের ভূমিকা আছে। একটি সামান্য জীবের মৃত্যুও সবার জন্য সর্বনাশ হতে পারে। প্রাকৃতিক ভারসাম্যের এই রহস্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না বুঝেও প্রকৃতিপূজকরা নিজেদের অজান্তেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতো। উল্টোদিকে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ অসুর দাসমাত্র— এই ভাবতে ভাবতে অসুররা প্রকৃতিকে তাচ্ছিল্য করতে শিখেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ শিথিল হয়ে গেছে তাদের। অসুররা আজকাল প্রকৃতিকে ধ্বংস করে আনন্দ পাচ্ছে। নির্বিচারে বন্যপ্রাণী শিকার হচ্ছে, বনানীর মূলোচ্ছেদ হচ্ছে পাইকারি হারে। এরা জানে না, নিজেদের কী সর্বনাশ এরা করছে। ভয় হয়, সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রই না ধ্বংস হয়ে যায় এদের অবিমৃশ্যকারিতার ফলে। এই জগতের সৃষ্টিকর্তার নাম কী, এই তর্কে অগণিত নরহত্যা হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, সত্যিই কি সৃষ্টিকর্তার নাম অসু? অন্য কিছুও তো হতে পারে? সৃষ্টিকর্তার আদৌ কি কোনও নাম আছে?

সত্যি বলতে কী, অসুবাদ খুবই সাধারণ একটা মতবাদ। যুক্তিতর্ক নেই, সন্ধান নেই, দার্শনিক মীমাংসা নেই, শুধুই একটা বিশ্বাস। গরিব খেটেখাওয়া মানুষদের জন্য এরকম মতবাদই দরকার, বলেছিল হিরণ্যকশিপু। গরিবদের প্রয়োজন একটা বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা, তর্কবিতর্কের কী প্রয়োজন তাদের? এমনটাই ছিল হিরণ্যকশিপুর মতামত, এখানে রয়েছে সমস্যা। যখনই কোনও অসুর জনগোষ্ঠী শিক্ষিত হয়ে ওঠে, সম্পন্ন হয়ে ওঠে, অসুবাদ তখন আর তাদের তৃপ্ত করতে পারে না। অসুবাদকে কেন্দ্র করে হাজার প্রশ্ন জাগে তাদের মনে। তাই হিরণ্যকশিপু থেকে মহিষাসুর— প্রতিটি অসুর-সম্রাট চেষ্টা করেছে সাধারণ মানুষকে গরিব করে রাখতে। অর্থবান হলেই যে স্বাধীন চিন্তা জাগে! অসুবাদ বদ্ধ জলাশয়, নতুন করে সেখানে তরঙ্গ ওঠবার জো নেই। এ যেন এক জেলখানা। স্বাধীন চিন্তা অসুবাদের জন্য অনিষ্টকর। লোকে হাঁসফাঁস করবে না তো কী করবে? কোনও রহস্য নেই, কোনও দার্শনিকতা নেই, কোনও জিজ্ঞাসা নেই। সেসব বিনে এই জীবনের আর অর্থ কী? একদিন যে পরম্পরাকে ইতিহাসের আবর্জনা ভেবে বিষবৎ পরিত্যাগ করেছিলাম, আজ সেই বিলুপ্ত পরম্পরার সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অসুধর্ম প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু পাপ করেছি। যদি জীবনের পরপারে অসু না থাকেন, তবে এই পাপের বোঝা থেকে কে মুক্তি দেবে আমাকে?

দুর্গা। বিরাট উপকার করেছে ও আমার। ধোঁকার টাটি মাথায় নিয়ে বাঁচছিলাম। ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিদিন একরাশ মিথ্যেকথা বলতে হতো। সেসব শেষ হয়েছে। খুব ভালো হয়েছে। জানি, ধর্মত্যাগের অপরাধে অসুররা আমাকে খুন করতে পারে। করলে করবে। মিথ্যের বোঝা বয়ে চলতে আর পারছি না।

নদীর ধারে এবড়োখেবড়ো পাথরে ঘেরা মণ্ডলাকার ফাঁকা জায়গা, তারই মাঝখানে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। দুর্গার দশ বন্ধু সেই অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে আছে। স্থানীয় বনবাসীরা ভক্তিভরে অনেক খাদ্যপানীয় রেখে গেছে সেখানে। সেইসব সদ্ব্যবহারের সঙ্গে গল্পগুজব চলছে মন্দলয়ে, নিরুদ্বিগ্ন মনে। দুর্গা গিয়ে বসলো সেখানে। মাতঙ্গী বসলো দুর্গার পাশেই, যেখানে ওর বীণা রাখা ছিল। দুর্গা এক এক করে ওর বন্ধুদের দিকে তাকালো। অনেক ভালোবাসা, অনেক শ্রদ্ধাভরে। নতুন করে চিনতে ইচ্ছে করে ওদের সবাইকে।

কালী। ও তো সবে বয়ঃসন্ধিতে পড়েছে, এখনও ছেলেমানুষী যায়নি। চকচকে ঘনকৃষ্ণ গাত্রবর্ণের পটভূমিতে ওর সফরীসম চোখদুটো, যেন অমাবস্যার রাতের গহনে দীপ্তমান ধ্রুবতারা। কোমরে বাঁধা খড়্গ। অন্ধকারে অদৃশ্য থেকে যুদ্ধ করতে পারে ও। শত্রুর জীবন থেকে নিমেষে সময়কে শুষে নিতে পারে। কালী যেন কালহন্তা। অহংকার-হন্তা। ওর প্রতিভার সামনে সবাইকেই নত হতে হয়। অংহকারীদের জন্য কালান্তক যম, সাধাসিধে মানুষদের জন্য মাতৃস্বরূপা। জন্ম

থেকেই ত্যাগী। কিছুতেই কোনও লোভ, কোনও মোহ নেই। ও যেন আমার গতজন্মের ছোট বোন।

কালীর পাশেই বসে আছে ভুবনেশ্বরী। গঙ্গানগরে ওই তো প্রথম আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। মমতাময়ী, সদা-যত্নশীলা, সবার প্রতি ওর স্নেহময়ী দৃষ্টি। এই দলের ও মাতৃস্বরূপা। পাশেই আলগোছে ফেলে রেখেছে অঙ্কুশ, ওর প্রিয় অস্ত্র। ওর উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, ওর নীল চোখ এরাজ্যে সচরাচর দেখা যায় না। ব্রঙ্গার সর্বত্র ওর পরিচিতি। সবার সঙ্গে যোগাযোগ ওর, সবার হাঁড়ির খবর রাখে ও। সবাই ওকে সম্মান করে, ভালোবাসে, ওর কথায় ভরসা করে বিপদে ঝাঁপ দেয়। অসীম ওর পরিচিতির পরিধি।

অগ্নিকুণ্ডের পাশেই রাখা ছিল একটি বীণা, কোলে তুলে নিয়ে তার তন্ত্রীতে অনুরণন তুলল মাতঙ্গী। ঝংকারে আনন্দে শিউরে উঠলো ফুলে ঢাকা বনতল। গুনগুন করে মাতঙ্গী তান ধরলো সন্ধ্যাকালের এক রাগিণীতে।

পোষা দাঁড়কাক কাঁধে, পাশেই বসে আছে ধূমাবতী। দাঁড়কাকটা ডানা ঝাপটাচ্ছে বারবার। ধূমাবতীর টিয়াপাখির মতো লম্বা নাকটা বেঁকে ঠোঁটের ওপর এসে পড়েছে। সে ঠোঁটের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে তীক্ষ্ণ একসারি দাঁত, কালো মিশিতে মাখা। কালো ঠোঁট ওর, মৃতদেহের মতো ফ্যাকাশে গায়ের রং। ওর বয়স কত? জিজ্ঞেস করলেই রেগে যায়। মুখের ও হাতের বলিরেখা দেখে মনে হয়, শতায়ু ও হয়েছে বহুকাল আগেই। তবুও ধূমাবতী আমাদের সকলের মতোই সুস্থসবল। কখনো কোনও ভালো পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরে না। তাপ্পিমারা ময়লা জামাকাপড়েই ওর আনন্দ। ওকে ছাড়া মহিষাসুরের বিরুদ্ধে এই বিজয় কখনোই সম্ভব ছিল না। গুপ্তবিজ্ঞানে ওর দক্ষতা অসামান্য। ভূভারতে এক ব্রঙ্গা বাদে রসায়নবিদ্যায় ওর মতো ব্যুৎপত্তি বোধহয় আর কারোর নেই। সাদা চুলের একটা গোছা এসে পড়েছে মুখের ওপর। মুখের চারপাশে একটা ধোঁয়াশা, একটা রহস্য তৈরি করেছে। পরিষ্কার দেখা যায় না মুখটা। সবসময় মনে হয়, ও যেন লুকিয়ে আছে কোনও এক ধোঁয়ার পর্দার আড়ালে। অনামা অখ্যাত অচেনা হয়েই থাকতে চায় ও। খ্যাতির মোহ নেই বিন্দুমাত্র। হয়তো ওই অসুন্দরের মূর্তি ধরে ধূমাবতী সবাইকে একটা শিক্ষা দিতে চাইছে। যেন কেউ বাহ্যিক রূপে না ভুলে তার আড়ালে গিয়ে মানুষকে চেনে।

পাশেই বসে আছে ছিন্নমস্তা। পরনে পোড়ামাটির রঙের কাপড়, বুকের কাছে একটা নীলপদ্ম গোঁজা। ডান কাঁধটাকে আয়েশে জড়িয়ে আছে ওর পোষা সাপটা। বাঁ হাতে আলগোছে ধরে আছে কাটারি, ওর প্রিয় শস্ত্র। দিব্যাস্ত্রের প্রহার নিয়েছিল ও, আমাকে বাঁচাতে। পৃথিবীতে ক'জন এমন করতে পারে, পরের জন্য? কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া? প্রাণের ভয় নেই ওর বিন্দুমাত্র। ওর গাত্রবর্ণ আজও টকটকে লাল, রক্তজবার মতো। দিব্যাস্ত্রের প্রভাবে। গলার চারপাশের গভীর কাটা দাগটা লুকিয়ে রাখার কোনও চেষ্টাই ও করে না কখনো। দেখে মনে হয় ওটা যেন ওর অলংকার, ওর গর্ব। আমি ওর একটা ডাকনাম দিয়েছি। বজ্রযোগিনী। ও এমন মেয়ে, যে বজ্রকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

আর ওই যে কমলা। সোনার বরণ, পরনে ঘন গোলাপি কাপড়, সোনালি পাড় তাতে। সম্পদের অক্ষয় ভাণ্ডার রয়েছে ওর কাছে। সমগ্র জম্বুদ্বীপে ওর চেয়ে ধনী আর কেউ নেই। সম্পদভরা ওর নৌবহর যখন সপ্তসমুদ্রে বাণিজ্য করতে বেরোয়, তখন সম্রাটরাও ঈর্ষাভরা সমীহের চোখে সেদিকে তাকায়। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে ছাড়িয়ে আছে ওর বাণিজ্যকেন্দ্র, ওর অনুগামীরা। ওই কোমল মুখমণ্ডলের আড়ালে এমন একজন নারী রয়েছে, ধনশাস্ত্র যার চেয়ে ভালো আর কেউ বোঝে না সপ্তসমুদ্রে। লোকে বলে, যার টাকা তারই জোর। ব্রঙ্গার বিদ্রোহের যাবতীয় খরচ জুগিয়েছে ও একা, কিন্তু একবারও নিজের জোর ফলানোর চেষ্টা করেনি। নিজের যাবতীয় ধনসম্পত্তিকে সমাজের সম্পদ মনে করে ও, নিজেকে সেই সম্পদের অছিমাত্র।

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA

Dry Type & Special Type Transformers

Head Office
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:
130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

আর ওই বসে আছে ষোড়শী। মাত্র ষোলো বছর বয়স। মাজা রং আর মায়াবী চাহনি, ওর মতো সুন্দরী ত্রিভুবনে আর কেউ নেই। বাহুমূলে জড়ানো দড়ির ফাঁস, ষোড়শীর প্রিয় শস্ত্র। চোখের চাহনিমাত্র দিয়ে সম্মোহিত করার ক্ষমতা আছে ওর। মানবমনের প্রতিটি গলিঘুঁজির খবর রাখে, জানে কিভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মানবমনের ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী হরেক ঔষধীর খবর রাখে ও। লোকে বলে, সৌন্দর্য ক্ষণভঙ্গুর। না, ষোড়শীর ক্ষেত্রে তেমনটা নয়। বঙ্গাবিদ্রোহের উন্মত্ত রণক্ষেত্রে নির্ভয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল ও। একা দানব-প্রহরীদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজটা তো ওই করেছিল। একবারও বুক কাঁপেনি ওর? ওই অনিন্দসুন্দর রূপ যুদ্ধক্ষেত্রে বিকৃত হয়ে যেতে পারে, সেটা ভেবে ভয়ে পিছিয়ে আসবার ইচ্ছে হয়নি?

ধূমাবতীর খনখনে স্বরে দুর্গার চিন্তাসূত্র ভেঙে পড়ল।

'নাঃ, মিথ্যে বলবো না, এসব খাবার ভালোই। তবে কী জানো বাছা, সত্যিকারের ভালো খাবার তো তোমরা খাওনি কখনো। আমি একদিন রান্না করতে পারি তোমাদের জন্য...'

'শোনো সবাই, শোনো!' বগলামুখী খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, 'বোধহয় আরেকটা নেমন্তন্ন লাভ হচ্ছে আমাদের।'

'আরেকটা চড়ুইভাতি!' বলল তারা।

'আরেব্বাস!' বলল ছিন্নমস্তা।

'নিশ্চয়ই, কেন নয় বাছা?' বলল ধূমাবতী, 'একদিন আমার বাসায় এসো তোমরা সব্বাই। আমার বাগানের টাটকা সবজি দিয়ে তোমাদের শুক্তো আর চচ্চড়ি রেঁধে খাওয়াবো, এই আমি কথা দিলাম।'

'কবে আসবো আমরা?' ভৈরবীর তর সইছে না আর।

'নেমন্তন্ন শুনে নাচছো?' বলল ভুবনেশ্বরী, 'আমার ক'টা কথা আগে শুনে নাও। ধূমাবতীর বাড়ি জলার গভীরে, সেটা কি জানো?'

'তাতে অসুবিধা কোথায়?' বলল তারা।

'হ্যাঁ' বলল ভৈরবী, 'যাবো না হয় জলার গভীরে। আমরা কি ভয় পাই? ভুরিভোজের জন্য যেখানে খুশি যেতে রাজি আছি।'

'নিশ্চয়ই যেতে পারো সেখানে' বলল ভুবনেশ্বরী, 'কিন্তু জলার গভীরে ধূমাবতীর বাড়ির বাগানে কী ফসল ফলে, সেটা জানো তো?'

'কী ফলে?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল ষোড়শী।

'কী আবার!' বলল ভুবনেশ্বরী, 'প্যাচপ্যাচে কাদার মধ্যে রকমারি ছত্রাক, শ্যাওলা, আগাছা গজায়। এছাড়া গেঁড়িগুগলি, ব্যাঙ... সেসব দিয়েই শুক্তো আর চচ্চড়ি রাঁধে ধূমাবতী।'

'ওয়াক!' শব্দ করল ষোড়শী। বাকিরা চুপ। নেমন্তন্ন ঘিরে যাবতীয় উৎসাহ মিইয়ে গেল এক লহমায়। ধূমাবতী অবাক।

'ছত্রাক, শ্যাওলা, গেঁড়িগুলি— এগুলো কি খারাপ জিনিস? অনেক পুষ্টিগুণ আছে এসবে।'

'ক্ষমা করো ধূমাবতী' বলল কমলা, 'যতই পুষ্টিগুণ থাকুক, ওসব খেতে পারবো না। তাছাড়া গেঁড়িগুগলি.. আমি তো নিরামিষাশী।'

'নিরামিষাশী! কেন, তুমি ইলিশ মাছ খাও না?' রেগেমেগে বলল ধূমাবতী।

'তুমি বরং অন্য কিছু বানাও না কেন?' বলল বগলামুখী।

'ভালো খাবার কাকে বলে, সে সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধারণাই নেই।

যাও, খেতে হবে না।' স্বভাবসিদ্ধ খনখনে গলায় বলে উঠলো ধূমাবতী।

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো, দুর্গাও। আবার দৃষ্টি ফেরলো বন্ধুদের দিকে।

আর ওই যে ভৈরবী, আগুনের অন্যধারে বসে আছে। একহাতে পরশু, অন্যহাত খাদ্য-পানীয়র সৎকারে ব্যস্ত। পরনে বাঘছাল। অসামান্য পেশীশক্তির অধিকারিণী, আমার দেখা সেরা যোদ্ধা ও। অতিমানবী। ভালোর সঙ্গে ভালো, খারাপের সঙ্গে ভয়ংকর। এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, সেই রাতে রণক্ষেত্রে ওর প্রবেশমাত্র অসুরসেনার কীরকম থরহরি কম্প জেগেছিল। বাঘেদের ওপর অসামান্য নিয়ন্ত্রণ ওর। এমনকী সুন্দরবনের প্রেতসদৃশ জন্ম-নরখাদক বাঘেদেরও এমনভাবে হুকুম দেয় ভৈরবী, যেন তারা ওর পোষা বেড়াল। লোকে বলে, মেয়েরা নাকি দুর্বল। ভৈরবীকে দেখলে সেকথা আর বলবে না। ওর সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে জিততে পারে এমন পুরুষ ত্রিভুবনে নেই।

বগলামুখী বসে আছে ভৈরবীর পাশেই। দুর্ধর্ষ তিরন্দাজ। বকসদৃশ লম্বাটে গড়নের মুখমণ্ডল। বকের মতোই লম্বাটে ঋজু ওর ওই গ্রীবা যেন প্রকৃতি ধনুর্বিদের উপযোগী করেই গড়েছেন। সবসময় ঠাট্টা-ইয়ার্কি দিয়ে মাতিয়ে রাখে সবাইকে। উজ্জ্বল হলুদ কাপড় গায়ে, হলুদ গাত্রবর্ণের সঙ্গে মানিয়েছে বেশ। দেখেশুনে মনে হয় সাধারণ এক মেয়ে। কিন্তু চোখদুটো দেখলে বেশ বোঝা যায়, এ কোনো সাধারণ মেয়ে হতে পারে না। তীক্ষ্ণ ওই চোখদুটো অন্ধকারে শার্দূলের জ্বলন্ত চোখের ভ্রম জাগায়। ওর তুল্য ধনুর্ধর ত্রিভুবনে আর নেই। এক লহমায় শত্রুকে বোবা করে দিতে পারে ও। যে কোনো সময় যে কোনো যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আছে ওর। শত্রুর ভাষাকে

মূক করতে পারে, জ্ঞানকে অজ্ঞান করতে পারে, জয়কে পরাজয়ে বদলে দিতে পারে ও।

বড় একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে ওই বসে আছে আছে তারা। আমার দেখা সেরা চিকিৎসক। ওর পাশে রাখা আছে ওষুধের বাটি আর কাঁচি। ও সবসময়ই তৈরি, যদি কেউ অসুখে পড়ে, বা আহত হয়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ওষুধের বাটিটা নরকরোটি দিয়ে তৈরি। সম্ভবত ব্রঙ্গার যুদ্ধে নিহত কোনো অসুরের মাথা থেকে তৈরি ওটা। ওটা দেখিয়ে বোধহয় তারা বলতে চাইছে, ধ্বংস ও সৃষ্টি দুটো আলাদা ব্যাপার নয়। একটির মধ্যে অন্যটির বীজ সুপ্ত থাকে। ওর ঘননীল গাত্রবর্ণ যেন সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তের আকাশ। মহিষের শাসনে নাজেহাল হয়ে অনেক পেশাদারই ব্রঙ্গা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তারাও তো চলে যেতে পারতো। কোনো দূর দেশে। হয়তো দূর সেই শুঙ্গভূমিতে। নির্ঝঞ্ঝাট নিষ্কণ্টক আরামের জীবন কাটাতে। যে কোনো সম্রাট ওকে রাজবৈদ্য হিসাবে পেয়ে ধন্য হতো। কিন্তু ও তা করেনি। সবচেয়ে অন্ধকার সময়ে ও ব্রঙ্গাবাসীদের পাশে থেকেছিল। নিজের নিরাপত্তার পরোয়া করেনি। লোকে বলে, পেশাদাররা কখনো কোনো ঝামেলার মধ্যে মাথা গলায় না। তারা কিন্তু নির্দ্বিধায় ঝাঁপ দিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। তারার আরেকটি অসামান্য গুণের কথা অনেকেই জানে না। বাগ্মিতায় ওর সমতুল্য খুব বেশি কেউ নেই এই জম্বুদ্বীপে। ব্রঙ্গার বিদ্রোহে নাগরিক-সমিতিগুলিকে পাশে পাওয়া গিয়েছিল, সেটা তারার বাগ্মিতা ও যুক্তির প্রভাবেই।

আর ওই তো মাতঙ্গী। আমার মন্ত্রণাদাত্রী, আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। ওকে আমি সব কথা বলতে পারি, আমার সব কথা ও বোঝে। সব পরামর্শ করতে পারি আমি ওর সঙ্গে। হাতে বীণা, কণ্ঠে স্বর্গীয় রাগিণী। সেই রাগিণীর সুর মিশে আছে চাঁদের জোছনায়, নীল আকাশের পরতে পরতে। জ্ঞানের ভাণ্ডার ও। কত কী যে ও জানে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তবু নিত্যদিন নতুন কিছু না কিছু শিখে চলেছে। এত গুণ ওর, তবু কেন ও এরকম সাধারণভাবে থাকে? জামাকাপড় অপরিষ্কার, গা-ময় শ্যাওলা, এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। সবসময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে থাকে, যেন ও কেউ নয়। নিজের জীবনের পরোয়া না করে অসুরপুরীতে গুপ্তচর হয়ে কাটিয়েছিল ও এক সপ্তাহ। মহিষাসুরের প্রতিরক্ষাকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দিয়েছিল কারোর বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না করেই। ও ছাড়া আর কেউ পারতো না এ কাজ। সমাজচ্যুত সেজে সমাজচ্যুতদের মধ্যে মিশে থাকতে ভালোবাসে ও। সমাজের অন্তজদের প্রতি সীমাহীন মমতা ওর। অসামান্য গুপ্তচর, অসামান্য যোদ্ধা। মন্ত্রদ্রষ্টা, সমরবিদ্যায় অপরিসীম ব্যুৎপত্তি। এত সবের পরেও কী সুন্দর গান গায় ও। কী সুন্দর বীণা বাজায়!

ওরা একে অন্যের থেকে কতটা আলাদা। অথচ কত না মিল ওদের কেন জানি না মনে হয়, আমরা এগারোজন একটা সত্তা। ওদের ছেড়ে গুরুকুলে ফিরে গিয়ে বাঁচবো কী করে?

দুর্গা খেয়াল করলো, মাতঙ্গীর চোখদুটো আধবোজা। এখনো বীণা বাজিয়ে চলেছে, কিন্তু ওর মন যেন অন্য কোথাও পড়ে আছে। আশপাশের এতসব কথাবার্তা, কোনোকিছুই যেন ওকে স্পর্শ করতে পারছে না। চড়ুইভাতির এই জায়গাটা ওরই পছন্দের। এতসব সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকতে এই জায়গাটাই কেন পছন্দ করলো ও? জায়গাটা ব্রঙ্গার সীমান্তে বলে কি? ও কি আমাদের সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে যে, মহিষাসুর শেষ হয়নি, সে ধারেকাছেই আছে?

কী এত চিন্তা করছো বলো তো?' মাতঙ্গীকে প্রশ্ন করলো দুর্গা, 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে, তোমার মাথার মধ্যে বিস্তর পরিকল্পনা ঘোঁট পাকাচ্ছে, সত্যি?'

'কী করে বুঝলে?' মাতঙ্গী বলল, 'মনপড়া শিখছো নাকি, কোনো শক্তিপীঠ থেকে?'

'বাজে কথা রাখো। কী ভাবছো সেটা বলবে?' দুগা অধৈর্য।

'দ্যাখো' বলল মাতঙ্গী, 'গত ক'দিন ধরে তুমি খুব চিন্তায় আছো, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কিছু বলছো না আমাদের। সেটাই ভাবছিলাম। কোন সে দুশ্চিন্তা তোমাকে ভাবাচ্ছে? আমার মনে হয়, সেটা ধরতে পেরেছি। সে সমস্যার কিছু সমাধানও আমার মাথায় রয়েছে। কিন্তু তার আগে বলো, এই যে দেখছি দিব্যি এত্তবড় একটা পিঠে খাচ্ছো তারিয়ে তারিয়ে, আমার জন্য রাখোনি?'

'পিঠে? সে তো ওই বনবাসীদের গ্রামে গিয়েছিলাম, সেখানে দিয়েছে। এখান থেকে বেশি দূর নয়, এক ক্রোশ হবে। পিঠে খেতে ইচ্ছে হয়েছে, তো সেখান থেকে একটা পিঠে নিয়ে এসো না কেন?'

মুখে দুষ্টুমির হাসি, দুর্গা কিছু বোঝার আগেই ওকে এক ধাক্কা দিল মাতঙ্গী। মাটিতে চিৎ হয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল দুর্গা। সেই ফাঁকে চিলের মতো ছোঁ মেরে দুর্গার হাত থেকে পিঠেটা কেড়ে নিয়ে দৌড় দিল মাতঙ্গী জঙ্গলের দিকে। লাফিয়ে উঠে দুর্গা পিছু নিল।

'আমার পিঠে ফেরত দে বলছি পোড়ারমুখী।' দুর্গা চেঁচিয়ে বলল, 'নাহলে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তোকে ধাওয়া

করবো।'

'পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত ধাওয়া করতে হবে না। বরঞ্চ একটা খেলা খেলি চলো' দৌড়তে দৌড়তে চেঁচিয়ে বলল মাতঙ্গী, 'আমি যদি ফিরে এসে ওই আগুনটাকে ছুঁতে পারি, তাহলে পিঠেটা আমার। আর যদি তুমি তার আগে আমাকে ধরে ফেলো তাহলে পিঠে তোমার। রাজি?'

'ঠিক আছে, ধরছি তোকে এক্ষুনি।' চিৎকার করে বলল দুর্গা।

প্রাণভরে হাসতে হাসতে দুজনে দৌড়লো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

অন্ধকার জঙ্গলের শুঁড়িপথে দূরে দেখা যাচ্ছে মাতঙ্গীকে, যেন হাওয়ায় ভেসে উড়ে চলেছে। লাফিয়ে পার হচ্ছে কাঁটাঝোপ, পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে লতাগুল্মর জটাজালের মধ্য দিয়ে। অনেক চেষ্টা করেও দুর্গা ওকে ধরতে পারল না, দুজনের মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমশ বেড়েই চলেছে। দুর্গা বারকতক রাস্তা বদল করে দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করল। মাতঙ্গী বারবারই পথ বদলে আবার দূরত্ব বাড়িয়ে নিল। একসময় পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল মাতঙ্গী। মরিয়া হয়ে দুর্গা গাছের ওপরে উঠে পড়ল, উঁচু ডালের ওপর দিয়ে দৌড়তে শুরু করল। দূরে আবার দেখা মিলল মাতঙ্গীর। গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে থেকে দুর্গা দেখতে পেল, দৌড়ের মধ্যেই বারকতক মোড় ঘুরলো মাতঙ্গী। তার মানে, একটা বৃত্তাকার পথ ধরেছে ও, যাতে পথের শেষে হঠাৎ করেই ওরা চড়ুইভাতির জায়গাটায় পৌঁছে যায়, দুর্গা বুঝতে পারবার আগেই। আরও কিছুক্ষণ চলল দৌড়। দুর্গা ডালের ওপর দিয়ে, মাতঙ্গী নীচ দিয়ে। তবু দুর্গা নাগাল পেল না মাতঙ্গীর। শেষমেশ দেখতে পেল, চড়ুইভাতির জায়গাটা কাছেই এসে পড়েছে। আগুনের শিখাগুলো নৃত্যবিভঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে আকাশের দিকে, যেন ঠাট্টা করছে দুর্গাকে। মাতঙ্গী তখন আগুন থেকে আর মাত্র হাতবিশেক দূরে, মরিয়া হয়ে দুর্গা ওর কোমরবন্ধ থেকে টেনে বার করল ত্রিশূলাকৃতির একটি ছুরি। নিভুল লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিল সেটাকে। মাতঙ্গীর পা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল ছুরিটা। ওকে স্পর্শ করলে না, কিন্তু ওর ঠিক সামনে মাটিতে গেঁথে গেল। সেই ছুরিতে হোঁচট খেয়ে আছাড় খেল মাতঙ্গী। গাছের ওপর থেকে সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্গা, মাতঙ্গীর হাত থেকে পিঠেটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। পিছলে বেরিয়ে গেল মাতঙ্গী, ডিগবাজি খেয়ে পরমুহূর্তেই ছুঁয়ে ফেলল আগুনের শিখাটাকে। উল্লাসে সবাই উলুধ্বনি দিয়ে উঠল। আয়েশে বসে মাতঙ্গী পিঠেয় বড় একটা কামড় বসালো।

'গেলো, যতখুশি গেলো,' হাল ছেড়ে বলল দুর্গা 'এবার বলবে তো, কী কথা বলবে বলছিলে?'

'নিশ্চয়ই বলবো,' বলল মাতঙ্গী, 'আগে একটু দম ফেলতে তো দাও।'

মুহূর্ত, পল, দণ্ড।

পিত্রালয়ের সামনে স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিল শ্রমণা, অনেকক্ষণ ধরে। কোলে ছ'মাস বয়সের ছোট মেয়েটা। পা আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ওর বড় মেয়েটা, দু'বছর বয়স। দরজায় করাঘাত করতে হাত উঠছে না। হাতটা যেন সিসের তৈরি, ভীষণ ভারী। আজ তিনবছর পর ও বাপের বাড়ি এল। মাত্র তিন বছর, মনে হচ্ছে যেন তিন যুগ। কিন্তু এ বাড়ির সঙ্গে ওর যে নাড়ির টান। এই আঙ্গিনাতেই তো অর বেড়ে ওঠা। কত স্মৃতি! কত আনন্দ, কত ব্যথা। অথচ আজ এই বাড়িটা কত অচেনা হয়ে গেছে। সব স্মৃতিই যেন কোন সে পরজন্মের স্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে।

অন্ধকার রাত। ঝিঁঝি ডাকছে।

এ রাজ্যের অর্ধেক জনসংখ্যা প্রকৃতিপূজক, মূলত অগ্নি-উপাসক। বাকি অর্ধেক অসুর। রাজা জন্মসূত্রে অগ্নি-উপাসক, কিন্তু অসুরদের সঙ্গেই তাঁর অধিক হৃদ্যতা। শোনা যায়, রাজা হওয়ার আগে ছাত্র হিসেবে তিনি যখন কশ্যপমুনির গুরুকুলে ছিলেন, তখন থেকেই তাঁর অসুবাদের প্রতি দুর্বলতা জন্মায়। রাজা হওয়ার পর থেকে তিনি অসুরদের নানাভাবে মদত জুগিয়েছেন। রাজ্যের চারণকবি ও নাট্যকাররা এমন সব নাটক লেখে, এমন সব নাটক মঞ্চস্থ করে, যাতে প্রকৃতিপূজকদের অপরাধপ্রবণ, ক্ষুদ্রমনা, ষড়যন্ত্রকারী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিসেবে দেখানো হয়। অসুরদের দেখানো হয় উদারমনা বীর হিসেবে। অসুর ধর্মগুরুদের দেখানো হয় সর্বত্যাগী ও পরোপকারী হিসেবে। রাজা এমনটাই চান। কোনো পথনাটিকায় অসুরদের খলনায়ক দেখানো তিনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এতে নাকি রাজ্যের শান্তিভঙ্গ হয়। প্রকৃতিপূজকদের খলনায়ক দেখাতে কোনো আপত্তি নেই। অগ্নিমন্দিরের পূজারিদের নিয়ে ব্যঙ্গরসাত্মক নাটিকাগুলো বিশেষ জনপ্রিয় এরাজ্যে। ভাঁড়দের সবসময়ই অগ্নি-পুরোহিতের সাজে সাজানো হয়। রাজ-অনুদানের অধিকাংশই যায় রাজ্যের সেইসব

Mahavir Institute of Education & Research

Affiliated with I. C. S. E.

&

I. S. C.

17/1, Canal Street, Kolkata - 700 014
Ph. No. 2265-5821/22

A School of UKG to Class - XII

(English Medium)

For Boys & Girls

বিদ্যালয়ে, যেখানে গুরুমশাইরা অসুর। ফলে প্রকৃতিপূজকদের দ্বারা পরিচালিত বহু বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। অধিকাংশ প্রকৃতিপূজক ঘরের ছেলে-মেয়েরা অসুরদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়েই বিদ্যাশিক্ষার জন্য যায়। শ্রমণাও তাই করেছিল।

ছবি আঁকতে ভালোবাসতো শ্রমণা। হাতের কাজ ভালো পারতো। ছোটবেলা থেকেই মাটির পুতুল গড়তে সিদ্ধহস্ত ছিল। তাই কুম্ভকারদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল ও। বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়দিনে খণ্ডভুজ যেচে ওর সঙ্গে এসে আলাপ করেছিল। অসুররা বীর, তারা মেয়েদের খুব যত্ন করে, সম্মান করে— এমনটাই জানতো শ্রমণা। তাই খণ্ডভুজকে সন্দেহ করার কোনো কারণ ঘটেনি। প্রধান গুরুমশাইয়ের সঙ্গে খুব ভালো পরিচয় ছিল খণ্ডভুজের। শ্রমণার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তাঁর। তার ফলে গুরুমশাই বিশেষ মনোযোগ দিতেন শ্রমণার শিক্ষার ওপর। কতক সেই কৃতজ্ঞতা থেকেই খণ্ডভুজের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো। খণ্ডভুজ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ওর বন্ধুদের সঙ্গেও। প্রকৃতিপূজক আর অসুরদের মধ্যে প্রভেদে বিশ্বাস করতো না খণ্ডভুজ। সবাই তো মনুসন্তান, তাহলে কেন এই বিভেদ? এমনটাই বলতো ও। খুব ভালো লাগতো ওর কথাগুলো।

কিছুদিনের মধ্যেই শ্রমণা খেয়াল করেছিল, ওর চারপাশে বন্ধুদের একটা অদৃশ্য বলয় তৈরি হয়েছে বিদ্যালয়ে। সেই বলয়ের সবাই অসুর। প্রকৃতিপূজক ছেলেদের সেখানে প্রবেশের অনুমতি নেই। খেয়াল করলেও সেটা নিয়ে বেশি ভাবেনি শ্রমণা। ধীরে ধীরে দেখল, বিদ্যালয়ের বাইরের অসুররাও এসে জুটেছে সেই বলয়ে। এমনকী রাস্তাঘাটেও একলা চলার উপায় নেই ওর। তখন ব্যাপারটা খারাপ লাগতো না। বরঞ্চ নিরাপদ বোধ হতো। মনে হতো, বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে। তারপর একদিন বাড়ি ফেরার পথে খণ্ডভুজ ওকে নিরালা এক উদ্যানে নিয়ে গিয়ে জোর করে সম্ভোগ করল। বাবা মা-কে বলতে পারেনি সেকথা। খুব কেঁদেছিল সেদিন রাতে। মনে হয়েছিল, শরীরটা অপবিত্র হয়ে গেল। সেই অপবিত্রতার অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল খণ্ডভুজকে। বাবা মা-র অমতে বিয়ে হয়েছিল অসুমন্দিরে। খণ্ডভুজ আর ওর বন্ধুরাই সব ব্যবস্থা করেছিল। বিয়ের সঙ্গে অসুধর্ম গ্রহণ করতেও বাধ্য করেছিল শ্রমণাকে। ঠাকুরমার দেওয়া 'শ্রমণা' নামটা ছেড়ে একটা নতুন নাম নিতে হলো। প্রতিজ্ঞা করতে হলো, এ জীবনে আর কখনো প্রকৃতিপূজা করবে না। অসু ছাড়া আর কারোর আরাধনা করলে প্রাণদণ্ড স্বীকার করতে হবে, এ প্রতিজ্ঞাও করতে হলো।

'তুমি তো প্রকৃতিপূজক আর অসুরদের মধ্যে বিভেদে বিশ্বাস করো না। তাহলে এসব কেন করাচ্ছো আমাকে দিয়ে?' প্রশ্ন করেছিল শ্রমণা। অসুরদের বিয়ে করতে গেলে নাকি এসব করতে হয়। এমনটাই বলেছিল খণ্ডভুজ। শ্রমণার লেখাপড়ার সেখানেই ইতি হলো। শুরু হল খণ্ডভুজের বাড়িতে বন্দিদশা। মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল ও খণ্ডভুজকে। ঘিঞ্জি বসতির পুতিদুর্গন্ধময় সেই বাড়ির মানুষগুলো প্রতিদিন ওর ওপর নির্যাতন চালাতো। শারীরিক, মানসিক। ওর পিত্রালয় এবং তাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে নিরন্তর ব্যঙ্গবিদ্রূপ চলতো। সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করতো শ্রমণা। শুধুমাত্র খণ্ডভুজের প্রতি ভালোবাসায়। বছর ঘুরতে ঘুরতে বাচ্চা হলো। একটা, তারপর আরও একটা। এই সময় জানতে পারলো খণ্ডভুজ সেই একই বিদ্যালয়ে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমে লিপ্ত, শিগগিরই নাকি সেই মেয়েটিকে বিবাহ করবে। এর সঙ্গেই শ্বশুরবাড়িতে ওর ওপর অত্যাচার উঠলো চরমে, সেই অত্যাচারে খণ্ডভুজও যোগ দিতে শুরু করলো। দিশেহারা শ্রমণা বুঝে উঠতে পারছিল না, হলোটা কী। এত ভালোবাসা, এত মনোযোগ, সব কীভাবে শুকিয়ে গেল?

একদিন আড়িপেতে খণ্ডভুজের সঙ্গে ওর বন্ধুদের কথোপকথন শুনেছিল শ্রমণা। তার সঙ্গেই জলের মতো সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। জেনেছিল, উত্তরাপথের অসুর-সম্রাট মহিষাসুর নাকি এই রাজ্যটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে উঠেপড়ে লেগেছেন। তার জন্য প্রয়োজন এরাজ্যে অসুরদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা নিয়েছেন মহিষাসুর। তিনি বিভিন্ন রকম অনুদান দেন অসুর যুবকদের। প্রকৃতিপূজকদের সঙ্গে ব্যবসা না করলে অনুদান পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য, যাতে প্রকৃতিপূজকদের ব্যবসায় মন্দা আসে, তাদের আর্থিক সক্ষমতা কমতে থাকে। প্রকৃতিপূজকদের ঘরের নারীদের ধর্মান্তরিত করে বিবাহ করলে প্রচুর অনুদান পাওয়া যায়। সেই অনুদানের লোভে বহু অসুর যুবক প্রকৃতিপূজক নারীদের বিবাহ করাটাই নিজেদের পেশা বানিয়ে ফেলেছে। এরা বিদ্যালয়ে যোগ দেয় শুধুমাত্র প্রকৃতিপূজক ছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য। বিদ্যালয়ের গুরুমশাইরাও এই ষড়যন্ত্রে জড়িত।

অনেক যন্ত্রণা সয়েছে শ্রমণা। সবই ভালোবাসার জন্য। কিন্তু যেদিন জানতে পারলো এটা ভালোবাসা নয়, ভালোবাসার অভিনয়— সেদিন সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পাপপুরী ছেড়ে পালিয়ে এসেছে ও, একবস্ত্রে। কিন্তু এতদূর এসেও দরজায় ধাক্কা দিতে হাত উঠছে না।

মনের সব শক্তি একজোট করে দরজায় ধাক্কা দিল শ্রমণা। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে আরও একবার। এবার বেশ জোরে।

‘কে তুমি, বাছা?’ দরজা খুলে বেরিয়ে এল মা।

‘মা! আমি! চিনতে পারছো না আমাকে?’

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মা। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ঘরের চৌকাঠে বসে শ্রমণাও অনেক কাঁদলো, মাকে ধরে। তারপর চোখের জল মুখে বাচ্চাদুটোকে মা-র কোলে তুলে দিল।

‘মা, আমি ভুল করেছি,’ বলল শ্রমণা, ‘কিন্তু এই বাচ্চাদুটো কোনো ভুল করেনি। এরা অমৃতের সন্তান। এদের তুমি প্রকৃতি-উপাসনার পরম্পরায় পালন করো।’

‘কোথায় যাচ্ছিস তুই?’ শঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করল মা।

‘এখানে থাকলে ধর্মত্যাগের অপরাধে আমাকে প্রাণদণ্ড দেবে ওরা। তাই ব্রঙ্গায় যাচ্ছি।’

‘ব্রঙ্গা! সেখানে তো শুনেছি গৃহযুদ্ধ চলছে। সেখানে মরতে কেন যাচ্ছিস?’

‘শুনেছি দুর্গা নামের একটি মেয়ে থাকে সেখানে। বয়সে সে আমারই মতো, কিন্তু এই বয়সেই সে মহিষাসুরকে যুদ্ধে পরাজিত করেছে। তার কাছে যাচ্ছি। যদি আমার এই নষ্ট জীবন তার কোনো কাজে লাগে। প্রতিশোধ নিতে চাই মা। এই নষ্ট জীবনটাকে সার্থক করতে চাই। আমার ভালোবাসা কিন্তু মিথ্যে ছিল না। প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলাম মানুষটাকে। সেই ভালোবাসাকে সার্থক করতে চললাম। ভালোবাসার মতো পবিত্র ব্যাপারটাকে যারা আগ্রাসনের হাতিয়ার করে তুলেছে, তাদের পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিতে চাই। যাতে আমার সঙ্গে যা ঘটেছে, আমার মেয়েদের সঙ্গে তা না ঘটে। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চললাম। জানি না, বেঁচে ফিরবো কিনা। যদি বেঁচে থাকি, তোমার কাছে ফিরে আসবো। এই বাচ্চাদুটোর কাছে ফিরে আসবো। যদি না ফিরি, তুমি ওদের দেখো। দেখো, ওদের পরিণতি যেন আমার মতো না হয়।’

একটু জল, সঙ্গে পিঠেয় আরেকটা কামড়। খানিকক্ষণ পরে মাতঙ্গী বললো, ‘দ্যাখো, ব্রঙ্গা থেকে মহিষকে আমরা তাড়িয়েছি, তা সপ্তাহখানেক হলো। তারপর থেকে আমাদের সবার মনেই অনেকরকম ভাবনাচিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। দেখি, সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করতে পারি কিনা। আচ্ছা, একটা কথা বলো, মহিষ-বিতাড়ন তো হলো। এখন আমাদের কী করা উচিত?’

‘মনপড়ার ক্ষমতাটা আমার নয়, তোমার গজিয়েছে মনে হচ্ছে।’ অবাক হয়ে বললো দুর্গা, ‘প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক। আমাদের এখন কী করা উচিত? নিজের নিজের জীবনে ফিরে যাওয়া?’

‘সেটাই তো যুক্তিসম্মত কাজ হবে, তাই না?’ বললো ষোড়শী, ‘চিরকাল তো আর যুদ্ধ করা যায় না।’

‘আজ জম্বুদ্বীপের বহু মানুষ আমাদের পরিত্রাতা বলে ভাবছে’, বললো কালী, ‘দেশের পরিস্থিতি ভুলে আমরা যদি নিজেদের জীবনে ফিরে যাই, অনেকেই খুব হতাশ হবে। আশাভঙ্গ হবে তাদের।’

‘ঠিক’, বললো ভৈরবী, ‘আরেকটা ব্যাপারও রয়েছে। যদি মহিষ প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে? সেই সম্ভাবনাটা কিন্তু প্রবল। যদি সে ফিরে আসে, কী করবো আমরা? তখন নতুন করে সবাইকে একজোট করা খুব কঠিন হবে।’

‘ঠিক কথা,’ বললো মাতঙ্গী, ‘তাই আমার মনে হয়, যে কাজটা আমরা শুরু করেছি, সেটাকে আগে শেষ করা দরকার। মহিষের মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নেই। যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।’

‘বলা সহজ, করা কঠিন’, খ্যানখ্যানে গলায় বলে উঠলো ধূমাবতী, ‘এই অবস্থায় লড়তে গেলে গো-হারান হার কপালে নাচছে।’

‘কেন এমন অলুক্ষুনে কথা বলছো?’ বললো বগলামুখী।

‘কেন?’ বললো ধূমাবতী। ‘কেন নয়? মহিষের সঙ্গে আছে অসংখ্য পাগল ধর্মান্ধ অসুর। মহিষের কথায় তারা আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারে। আমাদের কাছে কী আছে? একটাই জিনিস আমাদের পক্ষে ছিল, আর সেটা হল মহিষের অসতর্কতা। তোমরা কি মনে করো, যদি আমরা দলবল নিয়ে মহিষের গ্রামে হাজির হই, ও গতবারের মতো নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকবে?’

‘কথাটা ঠিক’, বলল কমলা।

‘তাই মহিষের সঙ্গে যেমন আছে অসংখ্য পাগল ধর্মান্ধ অসুর’, বললো ভুবনেশ্বরী, ‘তেমনি আমাদের দরকার প্রতিটি সাধারণ মানুষের সমর্থন, যারা এই পাগল ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে।’

‘কিন্তু কেন সাধারণ মানুষ আমাদের সমর্থন করবে?’ বললো মাতঙ্গী।

‘দেশের পরিস্থিতিটা দ্যাখো একবার। মহিষের হাতে এ

দেশের অসংখ্য শাসক খুন হয়েছে। শাসনতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে অধিকাংশ রাজ্যের। ফলে দেশজোড়া এক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। জায়গায় জায়গায় ডাকাত গুন্ডা বদমাইশদের রাজত্ব চলছে। ঘটনাচক্রে, এইসব গুন্ডা বদমাইশদের সবাই কিন্তু অসুর নয়। এদের লুঠপাট আর অত্যাচারে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে আজ। মানুষ আজ বুঝতে পারছে না, কে ভালো আর কে খারাপ।'

'ঠিক বলেছো', বললো বগলামুখী, 'আমি যদ্দুর জানি, এইসব ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচতে বহু মানুষ মহিষকেই সম্রাট হিসেবে চাইছে। এরা মহিষকে ঘৃণা করে, নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে অসুধর্ম গ্রহণ করার আগে এরা হয়তো আত্মহত্যা করবে, কিন্তু প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন ডাকাতের হাতে অত্যাচারিত হওয়ার অনিশ্চয়তার বদলে এরা মহিষকেই চাইছে। তাই মহিষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এদের সমর্থন তো আমরা পাবো না।'

'ঠিক এখানেই আমাদের সমস্যাটা রয়েছে', বললো মাতঙ্গী, 'সাধারণ মানুষ কী করে আমাদের বিশ্বাস করবে? কী করে তারা জানবে, আমরা ডাকাত নই, বিপ্লবী?'

'তুমি কী বলতে চাইছো, বুঝতে পেরেছি,' বললো দুর্গা, 'আমি তোমার সঙ্গে একমত। স্বৈরাচারী মহিষকে শুধুমাত্র একটা যুদ্ধে হারালেই মানুষের বিশ্বাস পাওয়া যায় না। আর মানুষের বিশ্বাস ছাড়া আমরা স্থায়ীভাবে মহিষকে পরাজিত করতে পারবো না। যদি না সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেয়, এ যুদ্ধের অন্তিম বিজয় আমাদের ভাগ্যে নেই। এটা আমাদের যুদ্ধ নয়, এটা সাধারণ মানুষের যুদ্ধ। কিন্তু কেন ওরা আমাদের ওপর ভরসা করে সর্বস্ব ত্যাগ করে এই যুদ্ধে ঝাঁপ দেবে? আমরাও যে অত্যাচারী নই, সেটা ওরা জানবে কী করে? যদি আমাদের নিয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের উদ্রেক হয় ওদের মনে, ওরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়বে। আর এটাই এই দেশটার মূল সমস্যা। দেশের সাধারণ মানুষ ভাবে, সব শাসকই চোর আর অত্যাচারী।'

'হ্যাঁ', মাতঙ্গী বললো দুর্গাকে, 'আর এই সমস্যাটার সমাধানই আমাদের আগে করতে হবে। তোমার কথা দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। ওরা যেন জানতে পারে, তুমি রাজত্ব করতে আসোনি। তুমি নিজের লড়াই লড়ছো না, ওদের লড়াই লড়ছো। ওদের ভালোর জন্য প্রাণপাত করছো। দেশসুদ্ধ লোক যেন তোমাকে আপনজন মনে করে। তোমাকে যেন ওরা শৈলসূতে-সিন্ধুসূতে বলে জানে। পাহাড় থেকে সমুদ্র, সবাই যেন তোমাকে তাদের নিজেদের ঘরের মেয়ে মানে। কাজটা কঠিন। কিন্তু যদি এটা করা যায়, দেখবে, এদেশের সাধারণ মানুষ দলে দলে এই লড়াইয়ে যোগ দেবে।'

'যদি সেটাই করতে হয়,' বললো দুর্গা, 'তাহলে তার পেছনে নিখুঁত একটা পরিকল্পনার প্রয়োজন। কাজটা শত্রুর এলাকায় গিয়ে করতে হবে। কেউ বন্দি হলে চলবে না, খুন হলে চলবে না। মাতঙ্গী, এই পরিকল্পনায় তোমার হরির সহায়তা প্রয়োজন হবে। আর একজনকে বিশেষভাবে দরকার। সে হল ব্রঙ্গার ভূতপূর্ব গুপ্তচর-প্রধান বিরূপাক্ষ। গুপ্তচর বিদ্যায় তার মতো ধুরন্ধর এই ভূভারতে আর দ্বিতীয় নেই।

কয়েকদিন পরের কথা।

অক্ষুমুনির আশ্রম এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় দ্বীপে। সমুদ্র, মোহনা, খাঁড়ি, নদী— এসবের মাঝখানেই আশ্রম। আজ সেই আশ্রমের সামনে সমুদ্রতীরে উঁচু একটা পাথরের ওপর বসেছিলেন অক্ষুমুনি। সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখা করছিলেন। পায়ের কাছে বসে তাই শুনছিল দুর্গা। ওর পাশেই হাঁটুগেড়ে যুক্তকরে বসেছিল অসুর-ধর্মগুরু আরক্ত। মহিষাসুরের রাজত্বকালে এই আরক্তর ওপরেই ন্যাস্ত ছিল সমগ্র ব্রঙ্গায় অসুধর্ম প্রতিষ্ঠার ভার। স্বভাব-দার্শনিক ও বোদ্ধা, এককালে অসুবাদের সবল প্রবক্তা হলেও সে বিশ্বাসে চিড় ধরেছিল বেশ কিছুকাল আগেই। মহিষাসুরের বিতাড়ানের পর আরক্ত এসে শরণ প্রার্থনা করে মুনির কাছে। তখন থেকেই ও রয়েছে আশ্রমে। মুনি স্নেহভারে ওকে 'আসুরী' বলে ডাকেন। দুর্গার একটা সন্দেহ আছে, এই আসুরীকে হয়ত মহিষই রেখে গেছে এখানে, গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য। তবে যদি সে উদ্দেশ্য থেকেও থাকে, মুনির জ্ঞানসমুদ্রে এই আসুরিক নুনের পুতুলটির দ্রবীভূত হতে বেশি সময় লাগবে না। এ সম্বন্ধে দুর্গা একপ্রকার নিশ্চিত। তবু ও প্রতিনিয়ত শ্যেনদৃষ্টি রাখে আসুরীর ওপর। সূর্যোদয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত ভাগীরথীর সাগরসঙ্গমে। ভোরের আলোয় কপিলবর্ণ মুনির অবয়ব জ্বলজ্বল করছিল অনন্ত জলধির পটভূমিকায়। মুনি বলছিলেন,

'ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা কে, কী তার নাম, এসব প্রশ্ন অবান্তর। তার চেয়ে বরং বোঝার চেষ্টা করা উচিত, ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ কী। ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ নিহিত রয়েছে দুই প্রাথমিক তত্ত্বের পারস্পরিক ক্রিয়ায়। এর মধ্যে একটি তত্ত্ব সদা-উদাসীন,

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ঃ—

KALA SANGAM

Kolkata

সুখ-দুঃখের অতীত, নিষ্ক্রিয়, নিখুঁত, নির্গুণ। এটাই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপ— নির্গুণ শূন্যতা। তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের এত রূপ রস রং গন্ধ আসে কোত্থেকে? এর কারণ দ্বিতীয় তত্ত্বটি। এটি সদাচঞ্চল, অঘটনপটিয়সী, কম্পনশীল। বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ। প্রথমটিকে আমি বলি চৈতন্য, দ্বিতীয়টিকে বলি প্রকৃতি। এই দুই তত্ত্ব যখন একসাথে কাজ করে...'

মুনির চিন্তা বাধাপ্রাপ্ত হলো দূর থেকে আগত কোলাহলে। তাকিয়ে দেখলেন, সহস্রাধিক নারীর একটি দল দ্রুত পদচারণায় এদিকেই এগিয়ে আসছে। স্মিত হেসে মুনি পাথর থেকে নেমে দাঁড়ালেন। দুর্গাকে বললেন, 'মা! কর্মমার্গ শ্রেয় না জ্ঞানমার্গ? এ তর্কের কোনো মীমাংসা নেই। তবে এই মুহূর্তে কর্মমার্গ হেঁটে এসে তোর দোরগোড়ায় উপস্থিত হয়েছে। তাই দর্শনের আলোচনা পরে হবে। চলো আসুরী, আমরা আশ্রমের ভেতরে গিয়ে বসি।'

আগত মেয়ের দল ভিড় করে দুর্গাকে ঘিরে ধরলো। দুর্গা চিনতে পারলো তাদের। মহিষের শাসনকালে দানবরা ব্রঙ্গার বহু মেয়েকে অপহরণ করেছিল। তাদের ব্যবহার করতো প্রতি রাতে, নিজেদের যৌনলালসা চরিতার্থ করতে। মহিষের পলায়নের পর সেইসব বন্দিনীরা মুক্তি পায়। তারা সবাই আজ জড়ো হয়েছে এখানে উঁচু পাথরটার ওপর উঠে বসলো দুর্গা। মেয়েরা ওর চারপাশ ঘিয়ে বসলো। দুর্গার ঠিক সামনে বসেছিল একটি অতীব সুন্দরী মেয়ে। লম্বা গড়ন, দীঘল চোখ। গাত্রবর্ণ গমের মতো, মেয়েটির নাম মালিনী।

'সেদিনটার কথা ভাবলে আজও আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে,' বললো মালিনী, 'আমার বাবা দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন, দানবসৈন্যরা আমাদের বাড়ির দিকেই আসছে। দেখামাত্র আমাকে বাড়ির পেছনের গোয়ালঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। লাভ হয়নি তাতে। ওরা এল। কোনো প্রশ্ন করল না। বাবা-মা ভাই— সবাইকে কচুকাটা করল। তারপর সোজা গোয়ালঘরে এসে আমাকে টেনে হিঁচড়ে বার করে নিয়ে গেল। হাত-পা বাঁথলো শিকল দিয়ে, খাঁচাগাড়িতে তুলল। ভেট দিল মহিষকে। তারপর থেকে প্রতি রাতে মহিষ আমাকে সম্ভোগ করতো। পশুর মতো অত্যাচার করতো। মারধর করতো, যন্ত্রণা দিত। প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিত, আমার জীবনটা কত মূল্যহীন।'

'আমাদের সবার কাহিনিই কতকটা এরকমই,' বললো আরেকটি মেয়ে, 'অনেক ব্রঙ্গাবাসী ভাবে, দানবরা অসভ্য, তাই ওরা এরকম যত্রতত্র নারীধর্ষণ করতো। কথাটা মোটেও ঠিক নয়। ওরা আগে থেকে রীতিমতো খবর যোগাড় করতো, কোন বাড়িতে কটা সুন্দরী বয়স্কা মেয়ে আছে। সেই বাড়িতে কী কী অস্ত্রশস্ত্র আছে, কোথায় কোথায় লুকোনোর জায়গা আছে, তারপর আক্রমণ করতো।'

'দিনের পর দিন পশুর মতো পালিয়ে বেড়াতে, লুকিয়ে থাকতে, শিকার হতে...' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো একটি মেয়ে।

'অসুররা বলে বেড়ায়, ওদের ধর্মে নাকি নারীর স্থান অনেক ওপরে।' বললো আরেকটি মেয়ে, 'তাই ওরা ওদের সমাজের নারীদের ঘরে বন্দি করে রাখে। যেন নারী কোনো মূল্যবান বস্তু, যাকে তালাচাবি দিয়ে রাখতে হয়।'

'যারা আমাদের সঙ্গে এরকম করতে পারে', বললো আরেকটি মেয়ে, 'কোন মুখে তারা নারীর সম্মানের বড়াই করে?'

'দানবরা উপর্যুপরি ধর্ষণ করতো আমাদের,' বললো অরেকটি মেয়ে, 'তারপর শখ ফুরিয়ে গেলে বিক্রি করে দিত অন্য দানবদের কাছে। ভাবতাম, এই দুঃস্বপ্নের কোনো শেষ নেই? কিন্তু সে দুঃস্বপ্ন শেষ হলো, যখন তুমি এলে। আমাদের মুক্ত করলে।'

'কী লাভ এই মুক্তির?' বললো আরেকটি মেয়ে, 'আমাদের বাবা-মা পরিবার পরিজন কেউ আর বেঁচে নেই। কোথায় ফিরে যাবো আমরা? সমাজ কি আর আমাদের ফিরিয়ে নেবে?'

'একবার মনে হয়েছিল আত্মহত্যা করি', বললো মালিনী, 'তারপর মনে হল, এ জীবন তো তোমার দেওয়া। তোমাকেই জিজ্ঞেস করি, কী করবো এ নষ্ট জীবন নিয়ে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো দুর্গা। তারপর বললো,

'যেদিন প্রথম গঙ্গানগরে এসেছিলাম, সেদিন আমার চোখের সামনে একটি মেয়েকে ধর্ষিতা হতে দেখেছিলাম। মেয়েটি আমার সামনেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। সে রাতটা দুঃস্বপ্নের মতো আজও আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। তাই একথা ভেবো না যে, তোমাদের যন্ত্রণা আমি বুঝি না। কিন্তু একটা কথা বলো, তোমরা কি শুধু তোমাদের নিজেদের যন্ত্রণার কথাই বসে বসে ভাববে? আজ এই মুহূর্তে তোমাদের বয়সী অগণিত মেয়ে অসুরদের হাতে অত্যাচারিত হচ্ছে জম্বুদ্বীপের আনাচে কানাচে। ধর্মের নামে ধর্ষিতা হচ্ছে প্রতিরাতে। পশুর মতো খাঁচায় করে প্রদর্শন করা হচ্ছে তাদের। ওদের প্রতি কি তোমাদের কোনো দায়িত্বই নেই? তোমরা নারী, সমাজকে সন্তানজ্ঞানে প্রতিপালন করার দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যস্ত। সন্তান বিপদে পড়লে বাঘিনী কী করে?'

'আমরা কীই বা করতে পারি?' বললো মালিনী, 'আমরা তোমার মতো নই। আমাদের ক্ষমতা কতটুকুই বা? আমরা

দুর্বল, অশক্ত। তাই তো আমরা এত যন্ত্রণা পেয়েছি, তবু একটা অসুরকেও মারতে পারিনি।'

ঠোঁটের কোণে যন্ত্রণাভরা হাসি, দুর্গা আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। তারপর বললো,

'একটা গল্প বলি, শোনো। এক শহরে এক জ্যোতিষী ছিল। ছক কেটে অভ্রান্তভাবে লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ -বর্তমান বলে দিত সে। শহরের প্রতিটি বণিক বাণিজ্যযাত্রায় বেরোনোর আগে তার কাছে কোষ্ঠীবিচার করতে আসতো। রোজগার ভালোই হচ্ছিল তার। নামডাকও হচ্ছিল অনেক। এসব দেখেশুনে তার পড়শীর হলো বেজায় ঈর্ষা। সে এক মতলব আঁটলো, কী করে জ্যোতিষীকে বদনাম করা যায়। একদিন সকালবেলা যখন জ্যোতিষীর ঘরে শহরের সব বড় বড় বণিকরা বসে আছে, তখন পড়শী এসে বললো, তুমি তো শুনি মস্তবড় জ্যোতিষী, বলো তো আমার হাতের মুঠির মধ্যে যে পাখিটা আছে, সেটা জ্যান্ত না মরা? জ্যোতিষী এক মুহূর্তে মতলবটা বুঝে ফেলল। পড়শী হাতের মুঠোয় একটা জ্যান্ত পাখি ধরে আছে। যদি জ্যোতিষী বলে পাখিটা জ্যান্ত, অমনি পড়শী পাখিটাকে টিপে মেরে ফেলবে। তারপর হাতের মুঠি খুলে বলবে, এই দ্যাখো, পাখিটা মরা। আর যদি জ্যোতিষী বলে পাখিটা মরা, তাহলে পরমুহূর্তেই পড়শী পাখিটাকে ছেড়ে দিয়ে বলবে, এই দ্যাখো, পাখিটা আসলে জ্যান্ত। জ্যোতিষী যাই বলুক না কেন, সবার সামনে ওর গণনা ভুল প্রমাণিত হবেই। কী করা যায় এখন? অনেক ভেবেচিন্তে জ্যোতিষী বললো, পাখিটার প্রাণ তো তোমার হাতে আছে ভাই। তুমি চাইলে ওটা জীবিত, তুমি চাইলে ওটা মৃত।'

গল্প শেষ করে দুর্গা চুপ করলো। তার সঙ্গে সবাই চুপ। বোঝা গেল, গল্পটা নাড়িয়ে দিয়েছে সবাইকে। বেশ খানিকটা সময় পার হয়ে গেল। দূরে বসে ছিল একটি মেয়ে। অনেকক্ষণ পর সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো,

'বুঝলাম। আমরা অশক্ত না সশক্ত, দুর্বল না সবল, সেটা আমাদের হাতেই রয়েছে। কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো, এখান থেকে ওখানে আমরা যাবো কীভাবে, সেটা জানি না। আমরা কী করবো, সেটা শুধু বলে দাও। তোমার সব কথা আমরা মানতে রাজি আছি। তুমি বললে, আগুনেও ঝাঁপ দিতে রাজি আছি আমরা।'

'নাম কী তোমার, ভাই?' প্রশ্ন করল দুর্গা।

'শ্রমণা', বললো মেয়েটি।

দুর্গা খানিকক্ষণ মেয়েটির পানে তাকিয়ে রইল। দেখেই বোঝা যায়, অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে মেয়েটির ওপর দিয়ে। তবু মানসিক দৃঢ়তার তেজে ভাস্বর মেয়েটির চোখমুখ। এরকম মেয়েরই তো দরকার আজ ভারতবর্ষে

'আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে না', বললো দুর্গা, 'শুধু তোমাদের চোখের জলকে প্রতিশোধের আগুনে পরিবর্তিত করতে হবে। তোমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ দাও আমাকে। তোমাদের দিয়ে আমি পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম সেনাবাহিনী গঠন করবো। তোমাদের ওই 'নষ্ট' জীবনের চিতাভস্ম থেকে এমন এক অবিনাশী অস্ত্র আমি তৈরি করবো, যা মহিষাসুরের সেনাবাহিনীকে ছারখার করে দেবে। আমরা সবাই মিলে এই জম্বুদ্বীপের প্রতিটি হতভাগিনীকে অসুরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করবো। আমরা নারী, আদ্যাশক্তি। শক্তি— কথাটার অর্থ কী, সেটা পৃথিবীকে নতুন করে বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। তোমাদের অশ্রু, ঘাম ও রক্তের ওপর অধিকার দাও আমাকে। যন্ত্রণা তোমাদের কাছে নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু সমরবিদ্যায় প্রশিক্ষণের সঙ্গে যে যন্ত্রণা আসতে চলেছে, তার তুল্য যন্ত্রণা ত্রিভুবনে আর হয় না। নতুন সেই যন্ত্রণার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য তৈরি হও। কথা দিচ্ছি, শক্তিস্বরূপিণী চামুন্ডাবাহিনীর অঙ্গভূতা রূপে তোমাদের অক্ষয় কীর্তিলাভ হবে।'

'এইসব আনকোরা ভীতু মেয়েদের দিয়ে তুমি অসুরদের পরাজিত করবে?' অবাক ভৈরবীর প্রশ্ন, 'না পেশীবলে, না যুদ্ধবিদ্যায়, কোনোকিছুতেই এরা দানবসেনার সমকক্ষ নয়। এদের...'

'গায়ের জোরে সব যুদ্ধ জেতা যায় না', ভৈরবীকে থামিয়ে দিয়ে বললো দুর্গা, 'নারী ও পুরুষের আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গী, চেতনা— এসবই একটু ভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল হয়, এটা নিশ্চয়ই জানো? পুরুষদের তুলনায় একটা গড়পড়তা মেয়ের পেশীবল কম হতে পারে, কিন্তু এর বিপরীতে পুরুষদের তুলনায় আমাদের জীবনীশক্তি বেশি, স্মৃতিশক্তিও বেশি। পরাবিদ্যায় আমাদের স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি রয়েছে। পারিপার্শ্বিক দৃষ্টি আমাদের বেশি ধারালো। নারীর বৈশিষ্ট্যগুলোকে দাবিয়ে নয়, যুদ্ধের ময়দানে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে কীভাবে শত্রুদমন করা যায়, সেটাই এইসব মেয়েদের শেখাতে হবে। মহিষাসুরের সেনা চিরকাল পুরুষদের সঙ্গে লড়ে এসেছে, আমাদের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যটা বুঝে উঠতেই ওদের বহু সময়

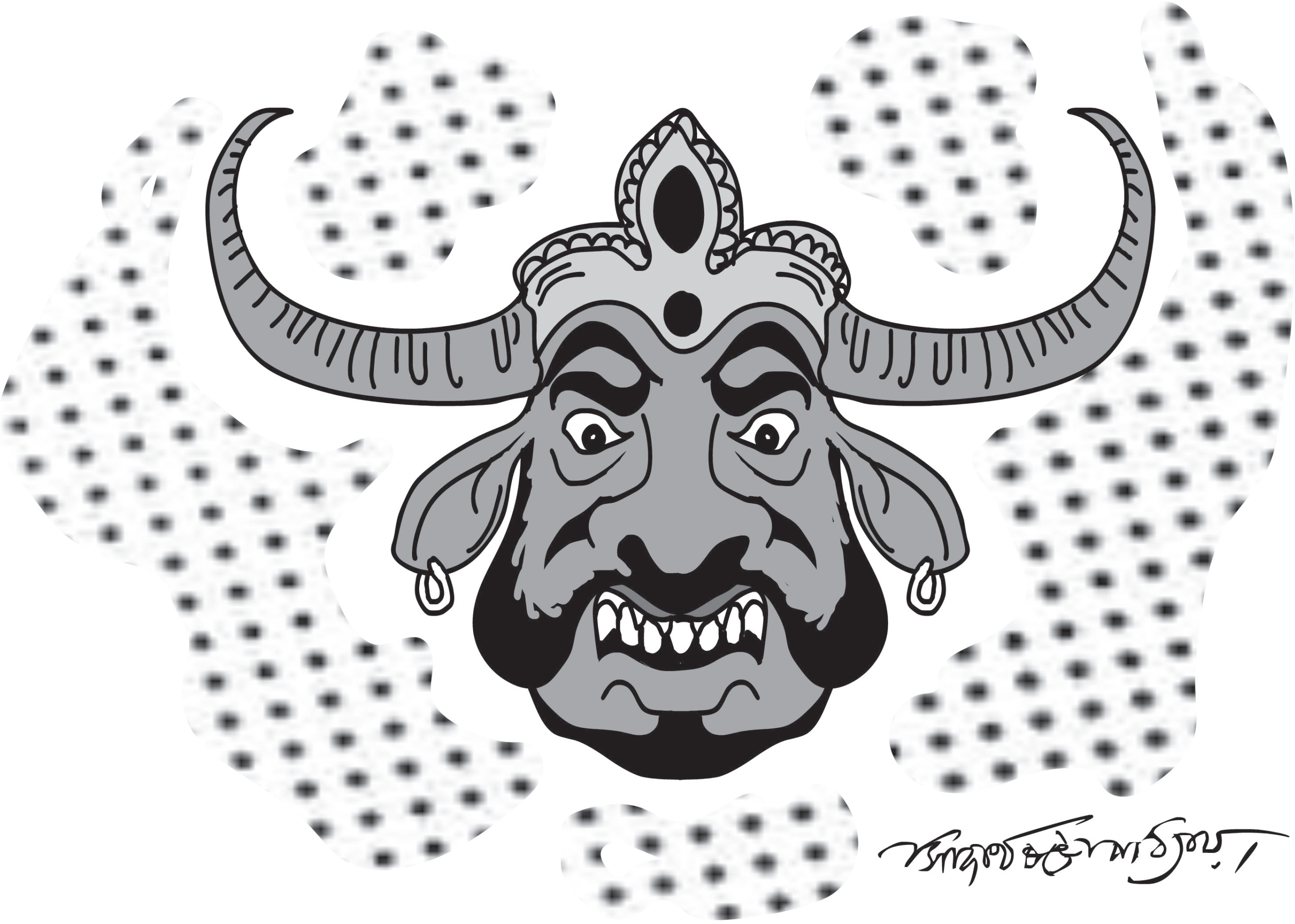

লেগে যাবে। আর সেটাই হবে আমাদের তুরুপের তাস। তুমি আজই এদের সেইমতো প্রশিক্ষণ দিতে লেগে পড়ো। কালী ও বগলামুখী তোমাকে সহায়তা করবে।’

পরবর্তী কয়েকমাস প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কাটলো। চামুণ্ডাবাহিনীর প্রশিক্ষণ চললো দিনরাত। খবর পেয়ে ভারতবর্ষের নানান প্রান্ত থেকে নিপীড়িতা মেয়েরা এসে জড়ো হতে লাগলো ব্রঙ্গায়। একটাই তাদের আকাঙ্ক্ষা, প্রতিশোধ নেওয়ার একাট সুযোগ। চামুণ্ডাবাহিনীর কলেবর দিনে দিনে বাড়তে লাগলো শশীকলার মতো। ধূমাবতী ব্যস্ত রইল তার জলার বাড়িতে খিল এঁটে নতুন নতুন রাসায়নিক অস্ত্রের গবেষণায়। কমলাও ব্যস্ত রইল এক বিশেষ কাজে। ব্রঙ্গার প্রতিটি কারিগর-সমিতি, বণিক সমিতি ও মন্দিরের সঙ্গে দফায় দফায় গুপ্ত বৈঠক করতে হল ওকে।

ভুবনেশ্বরী, মাতঙ্গী ও তারা এই ক’মাস ঘুরে বেড়ালো উত্তরাপথের প্রতিটি জনপদে। মকর উপকূল থেকে প্রাগজ্যোতিষ, বিস্তীর্ণ এই ভূখণ্ডের প্রতিটি অসুরবিরোধী বসতিতে পৌঁছে গেল ওরা। মহিষের শত্রু প্রতিটি উপজাতির সঙ্গে ওরা বৈঠক করল। দুর্গার কথা ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল মহিষের লজ্জাজনক পরাজয় ও পলায়নের কথা। অসুররা চেষ্টা করেছিল, খবরটা চেপে দিতে। জায়গায় জায়গায় রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল ওরা। নিজেদের গুপ্তচর বাহিনীকে পুরোপুরি নিয়েজিত করেছিল, ওদের তিনজনকে খুঁজে বার করতে। সফল হয়নি। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। দেশসুদ্ধু লোক যাকে এতদিন অজেয় বলে জানতো, এবার জানলো সে এগারোটি মেয়ের হাতে পরাজিত হয়ে ল্যাজ গুটিয়ে ব্রঙ্গা ছেড়ে পালিয়েছে। এত দ্রুত এত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে কী করে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল তা কেউ জানে না। শোনা গিয়েছিল, বিষ্ণু নাকি ওদের সাহায্য করছে। কেউ একজন ভুবনেশ্বরীকে দেখেছিল অতিকায় এক প্রাগৈতিহাসিক পক্ষীর পিঠে চেপে উড়তে। লোকে সে কথা বিশ্বাস করেনি।

আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটলো এই ক’মাসে।

সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত। একদল ব্রঙ্গাহৃদি সেই রাতে জমায়েত হয়েছিল মাতলী নদীর তীরে। গ্রাম ও নগরের সভাগুলোর প্রতিনিধিরা ছিল সেখানে, কারিগর ও বণিক

সমিতির প্রতিনিধরাও ছিল। আর ছিল ব্রঙ্গার প্রতিটি মন্দিরের পূজারিরা। সে যুগে মন্দিরগুলোই ছিল সাধারণ মানুষের ধনভাণ্ডার ও কারিগরদের মূলধনের উৎস। তাই রাজ্য পরিচালনায় তাদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। আর উপস্থিত ছিল কালী। সেই রাতে আকাশে বিরাট একটা চাঁদ উঠেছিল। বছরের সবচেয়ে বড় চাঁদ। জ্যোৎস্নার বান ডেকেছিল মাতলীর বুকে। ব্রঙ্গার গহীন বনভূমি মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিল সেই জ্যোৎস্নার নেশায়। সেখানে অক্ষুমুনি রাজকুমার দিব্যবলের রাজ্যাভিষেক করলেন।

আরও একটা অসামান্য ঘটনার সাক্ষী থেকে গেল সেই কোজাগরীর চাঁদ।

হিমালয়ের গহনে লুকোনো এক দুর্গম উপত্যকায়, মহিষের গুপ্তচরদের শ্যেনদৃষ্টি থেকে অনেক দূরে, সূর্য চন্দ্র অগ্নি বরুণ আদি জম্বুদ্বীপের প্রতিটি প্রকৃতি-উপাসক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সমবেত হল। বরফে ঢাকা সেই মায়াবী উপত্যকায় দুটো সরোবর ছিল। অথৈ তুষারের রাজত্বে যেন কোন সে মন্ত্রবলে দুটো সরোবরেই জল ছিল তরল। একটি সরোবর অর্ধচন্দ্রাকৃতি, তার জল নোনা। অন্যটি সূর্যাকৃতি, তার জল মিষ্টি। প্রতিনিধি দেবতারা এই দুই সরোবরের মধ্যবর্তী স্থানে মিলিত হলো। সঙ্গে দুর্গা, রুদ্র ও হরি। ব্রহ্মা-সম্প্রদায়ের প্রধানও ছিল উপস্থিত।

মিত্র, অর্থাৎ সূর্য-উপাসকদের প্রধান ছিল অনুষ্ঠানের সভাপতি। নব্বই-ঊর্ধ্ব এক বিধ্বস্ত হতাশ বৃদ্ধ, লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মন্দকণ্ঠে বলল,

'একটা যুগ ছিল, যখন 'মিত্র' নামটির সামনে মাথা নত করতো অর্থেক পৃথিবী। সুদূর সুখধারা ও শোনা উপকূলেও আমাদের ভাই-বোনেরা ছিল। পিত্রনগরী থেকে থোর কলবা, সর্বত্রই আমরা প্রভুত্ব করতাম। সে সব আমরা হারিয়েছি আমাদের অহংকারের জন্য। আমরা ভেবেছিলাম, আমরা অন্যদের থেকে জ্ঞানী, অর্থবান। সবদিক থেকে এগিয়ে। সেই অহংকারের বশে আমরা খেয়ালও করিনি, কবে সবকিছু বদলে গিয়েছে। আমাদের শত্রুরা আমাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে পেরেছে, তাই আজ আমাদের এই অবস্থা। অনৈক্যই আমাদের মূল সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান আজ আমরা করবো। আজ থেকে আমরা যাবতীয় সিদ্ধান্ত একসঙ্গে বসে নেবো। আজ থেকে দেবতারা সবাই এক স্বরে কথা বলবে। সেই স্বর হবে আমাদের নেতা ইন্দ্রর। আর প্রথম ইন্দ্র হিসাবে যার নাম আমি আজ প্রস্তাব করতে যাচ্ছি, তার নাম শুনে হয়তো আপনারা অবাক হবেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই, এটা ঠিক, আমরা অর্থাৎ মিত্র ও বরুণ আজও দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু সংকটের মুহূর্তে আমরা দেবতাদের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছি। সেই দুঃসময়ে আমাদের ভরসাকে জীবিত রেখেছিল বজ্র। পবনকে সঙ্গে নিয়ে মাটি কামড়ে লড়াই চালিয়ে গেছে ও। দুরাশার আগুনটাকে নিভতে দেয়নি। বজ্র ও পবনকে আমরা এককালে প্রান্তিক জনজাতির বলে ভাবতাম, অবজ্ঞা করতাম। নিজেদের গুণে ওরা আজ দেবসমাজের নেতৃত্ব অধিকার করেছে। আমাদের প্রথম ইন্দ্র হিসেবে আমি প্রস্তাব করছি বজ্রর নাম। ওর নেতৃত্বে আমরা সংগঠিত হবো, অসুরদের বিরুদ্ধে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নামবো। যার যার এই প্রস্তাবে সম্মতি আছে, তারা হাত তুলুন।'

অতীতের নেতৃত্ব স্বেচ্ছায় নিজের শাসনদণ্ড নবীন নেতৃত্বের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে দেখে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠল হতাশায় জর্জরিত সমবেত দেবগণ। হৈহৈ করে দুহাত তুলে তারা স্বাগত জানালো প্রস্তাবকে। এর সঙ্গেই শুরু হলো সভার দ্বিতীয় চরণ।

হাতে ত্রিশূল, রুদ্র উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল দুর্গার দিকে। কেন জানি না, হঠাৎ দুর্গা মনে হলো, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, হৃদপিণ্ডের গতিবেগ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠছে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করল দুর্গা। এসব কিছুই খেয়াল করল না রুদ্র। নিজের ত্রিশূল দুর্গার হাতে রেখে বলল,

'শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায় তুমি ইতিহাসের গতি বদলে দিয়েছ, আমাদের সবার মনে আশা জাগিয়েছ। সামনে রয়েছে অসম্ভব এক কাজ। এ কাজ আমরা একা কেউ করতে পারবো না। কিন্তু হয়তো আমাদের সম্মিলিত শক্তি একাজে সফল হবে। নেতৃত্বদানের অসামান্য ক্ষমতা রয়েছে তোমার। এছাড়াও তোমার কারোর সঙ্গে অতিরিক্ত সখ্য নেই, শত্রুতাও নেই। তুমিই পারবে আমাদের সবার শক্তিকে একত্র করতে। আমার ত্রিশূল আমি তোমাকে দিলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে এই ত্রিশূল দেখলেই আমার ভূতগণ তোমাকে অনুসরণ করবে।'

রুদ্রর পরে উঠে দাঁড়ালো হরি। বললো,

'বোন, তুমি আদ্যাশক্তি মহামায়া, জগতের মাতৃস্বরূপা। সপ্তসিন্ধু আজ তোমার জয়গান গাইছে। এই সমাজ, এই রাষ্ট্র আজ নবজীবন পেয়েছে তোমার জন্য। কারোর সাহায্য ছাড়াই তুমি এতকিছু করেছ। আমাদের সবার সাহায্য পেলে তুমি নিশ্চয়ই এই দেশটাকে পাপমুক্ত করতে পারবে। এই নাও আমার সুদর্শন চক্র। এর সঙ্গে বিষ্ণুর সমস্ত শক্তি তোমার অনুসারী হবে, এই অঙ্গীকার আমি করলাম। আমি এও অঙ্গীকার করলাম, সুখেদুঃখে বিপদে আপদে তোমার এই ভাই হরি সবসময় তোমার পাশে থাকবে, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত।'

শ্বেতশুভ্র উত্তরীয় সামলে উঠে দাঁড়ালো ব্রহ্মা। বললো,

'মা, মহিষকে দিব্যাস্ত্রর প্রযুক্তি দিয়ে আমরা বড় ভুল করেছি। বোদ্ধা হওয়ার, সর্বজ্ঞানী হওয়ার অহংকার আমাদের অন্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের অস্ত্র দেশজুড়ে যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, তা দেখে আমরা সীমাহীন লজ্জিত। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। এই নাও, আমার কমণ্ডলু। এর সঙ্গে আমার সম্প্রদায়ের সাহায্যের অঙ্গীকার আমি করলাম। আমাদের সেনাবাহিনী নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় শক্তি আছে আমাদের কাছে। তোমার আগামী যুদ্ধের জন্য ভয়ংকরতম সব দিব্যাস্ত্র নির্মাণ করবো আমরা। সেসব দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করে তুমি অসুরসেনাকে ছারখার করে দিও।'

বজ্র, দেবতাদের নবনির্বাচিত ইন্দ্র উঠে দাঁড়ালো। বলল,

'মা, তুমি আদ্যাশক্তি মহামায়া, জগতের মাতৃস্বরূপা। সন্তানকে রক্ষা করতে মা অসাধ্য সাধন করে। আমরা তোমার সন্তান, তুমি আমাদের রক্ষা করো। আমার শায়ক আমি তোমাকে দিলাম। আমাদের সম্প্রদায়ের প্রিয় অস্ত্র এটি। এর সঙ্গে আমার সম্প্রদায়ের দ্বিধাহীন সমর্থনের অঙ্গীকার আমি করলাম। মৃত্যু পর্যন্ত আমরা তোমার সঙ্গে থাকবো।'

এক এক করে বাকি দেবতারাও এগিয়ে এল। বরুণ দিল তার শঙ্খ, অগ্নি দিল তার বর্শা। পবন দিল তার ধনুর্বাণ, বিশ্বকর্মা তার বর্ম ও কুঠার। যম দিল তার কালদণ্ড। সেই রাতে, তুষারমৌলী হিমালয়ের তুঙ্গে পবিত্র সেই উপত্যকায়, পূর্ণচন্দ্র ও কৈলাশ পর্বতকে সাক্ষী রেখে এক অসামান্য ঘটনা ঘটল। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সংরচনা চিরদিন এই ঘটনাটির কাছে ঋণী থাকবে। এই একটি ঘটনা বদলে দিল আগামী যুগের ইতিহাস।

ছ'মাস পরের কথা।

মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ মালভূমিতে সমবেত হয়েছে মহিষাসুরের সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী। পাঁচ লক্ষ মোষের খুরের ঘর্ষণে আকাশ ধুলোয় মেঘলা হয়ে গেছে। সূর্যের মুখ দেখা যায় না। বহুক্ষণ ধরে এখানে প্রতীক্ষা করছে মহিষাসুর। দিনের দ্বিতীয় প্রহর প্রায় অতিক্রান্ত। এর মধ্যেই তো এসে পড়ার কথা তার। এখনো এসে পৌঁছলো না কেন?

হঠাৎ তূর্যনিনাদে কেঁপে উঠল মাটি। সবুজ পাহাড়ে জাগলো আন্দোলন। জঙ্গল ভেদ করে আবির্ভূত হলো ত্রিশূলব্যূহে সজ্জিত অতিকায় অভূতপূর্ব এক সেনাবাহিনী। সে সেনাবাহিনীর দক্ষিণ বাহুর নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহাপক্ষী গরুড়ে আসীন হরি। তাঁর পেছনে সারিবদ্ধভাবে প্রতীক্ষারত বিষ্ণুর বাহিনী। শৃঙ্খলাপরায়ণ, যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। তাদের শীতল দৃঢ়চেতা দৃষ্টি প্রত্যয়ের আলোয় উদ্ভাসিত। সেনাবাহিনীর বাম বাহুর নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহাকায় এক বৃষে আসীন ত্রিশূলপাণি রুদ্র। তাঁর পেছনে সমবেত হয়েছে শিবের প্রথমবাহিনী। তারা প্রেতকল্প, উগ্রতেজা, উগ্রচণ্ডা। মাথায় জটাজুট, শ্মশ্রুগুম্ফে ঢাকা তাদের মুখ। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, ভস্মাচ্ছাদিত রুধিররঞ্জিত দেহ। তাদের মুহুর্মুহু রণহুংকার ও আস্ফালনে মৃত্যুর হৃদয়েও ভয়কম্প জাগে। এদের সঙ্গে, জম্বুদ্বীপের প্রত্যেক প্রকৃতি-উপাসক সম্প্রদায় তাদের শ্রেষ্ঠ বীরদের নিয়ে সমবেত হয়েছে বিশাল সংখ্যায়। সমুদ্রের মতো বিশাল তাদের ব্যাপ্তি। বাহিনীর মধ্যভাগ রক্ষা করছে তারা। বিচিত্র তাদের পোশাক, ততোধিক বিচিত্র তাদের অস্ত্রশস্ত্র। এই ব্যূহের সম্মুখভাগ রক্ষা করছে ব্রঙ্গার সেনাবাহিনী। তাদের এক লক্ষ অতিকায় রণহস্তীর ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপে গুরুগুরু কাঁপছে ধরাধাম। হরিহরের যৌথ আহ্বানে সাড়া দিয়ে জম্বুদ্বীপের পূর্ববাহু থেকে, প্রাগজ্যোতিষের ওপারের শুঙ্গভূমি থেকে তিন লক্ষ সেনানী এসেছে এই মহারণে যোগ দিতে। সুদূর ব্রহ্ম, শ্যাম, চম্পা, বরুণ, সুমাত্রা, মহার্লিকা, যবদ্বীপ, কালীমন্থন থেকে এসেছে তারা — জম্বুদ্বীপের অপৌরুষেয় সংস্কৃতিকে সমূহ বিনাশ থেকে রক্ষা করতে। বাহন তাদের খর্বাকৃতি হস্তী। সে হস্তী অশ্বের মতো দ্রুতগামী, ক্ষুরধার বুদ্ধি তাদের। অনায়াসে পাহাড় টপকায়, অবাধে ভেদ করে ঘন বনানী। বাহিনীর অন্তভাগে দুর্ভেদ্য এক অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ রচনা করেছে তারা। অভূতপূর্ব এই অতিকায় বাহিনীকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক অসামান্য তেজস্বিনী নারী, এক অতিকায় সিংহে আরোহিণী। রক্তবর্ণের বস্ত্র পরনে, স্বর্ণরঞ্জিত রক্তবর্ণের মণিবদ্ধ হাতে জড়ানো। তাঁর পেছনে দশজন নারী-যোদ্ধা, দশ মহাবিদ্যা। কালী, ভুবনেশ্বরী, কমলা, ভৈরবী, বগলামুখী, ষোড়শী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, তারা। কেউ বাঘ, কেউ সিংহ, কেউ বা নেকড়ের পিঠে আসীন। প্রত্যেকের হাতে ব্রহ্মা-সম্প্রদায় নির্মিত বিবিধ দিব্য-আয়ুধ। তাদের পেছনে জমায়েত হয়েছে প্রতিশোধ-লোলুপ রণচণ্ডী নারীবাহিনী। এ দৃশ্য যেন ঠিক দুঃস্বপ্নের পরত থেকে উঠে এসেছে। ভয়ে হৃদকম্প জাগলো মহিষের বুকে, গলা শুকিয়ে এল।

'বিদল, পরিস্থিতি কীরকম বুঝছো?' দানববাহিনীর

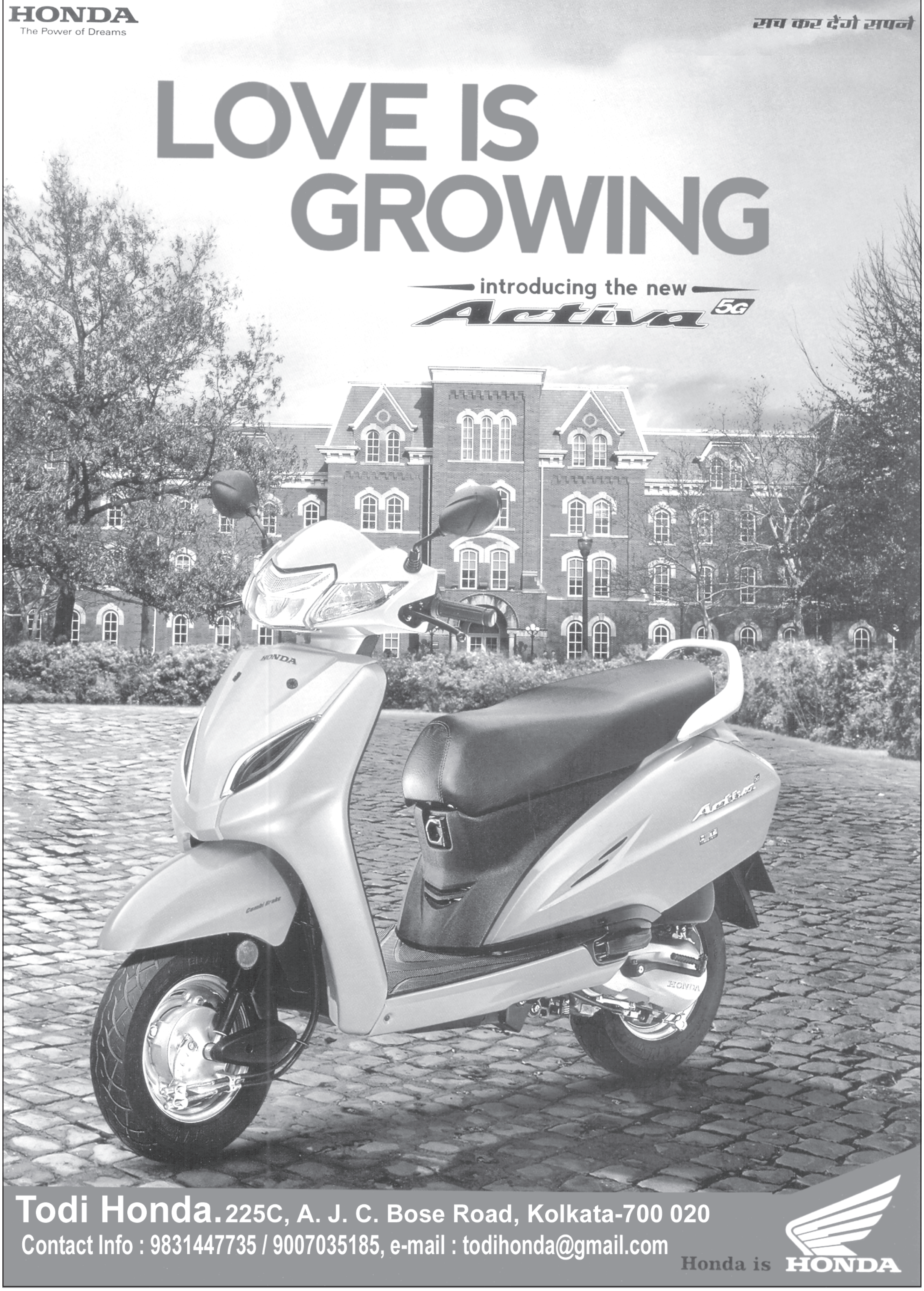
HONDA
The Power of Dreams
सच कर देंगे सपने
LOVE IS GROWING
introducing the new
Activa 5G
Todi Honda. 225C, A. J. C. Bose Road, Kolkata-700 020
Contact Info : 9831447735 / 9007035185, e-mail : todihonda@gmail.com
Honda is HONDA

মহাসেনাপতিকে ডেকে বললো মহিষাসুর।

'সম্রাট', বললো বিদল, 'সত্যি বলতে কী, এত বিপুল সৈন্যসমাবেশ আমি আশা করিনি। কীভাবে আমাদের গুপ্তচররা এতবড় সৈন্য সংগঠনের সংবাদ পেল না, সেটাই আশ্চর্য। সব হিসেব গোলমাল হয়ে গেল।'

'হিসেব যখন গোলমাল হয়ে গেছে', সুদীর্ঘ এক শ্বাস নিয়ে বললো মহিষ, 'তখন নতুন করে হিসেবে কষা যাক। ওদের এক লক্ষ অতিকায় রণহস্তী, আমাদের পাঁচ লক্ষ রণমহিষ। মুখোমুখি সংঘর্ষে কে শেষপর্যন্ত টিকে থাকবে?'

'যদি পাঁচটি মোষ মিলিতভাবে একটি হাতিকে আক্রমণ করে, তবে হাতিকে পরাজিত করতে পারে। কিন্তু...'

'এর মধ্যে কিন্তু কী?' বললো অধৈর্য মহিষাসুর।

'মোষের বুদ্ধি হাতির তুলনায় কম। তার ওপর মোষ যদি হাতি দেখে ভয় পেয়ে যায়, তাহলে কী হবে বলা যায় না।'

'তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? ব্রঙ্গাহ্নদিদের হস্তীবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ানোই কঠিন! এর ওপর এরকমই আরেকটি হস্তীবাহিনী রয়েছে ব্যূহের পেছনে। বাকি বাহিনীগুলোর কথা তো ছেড়েই দিলাম। তাহলে? কোনো আশাই কি নেই?'

'একটা উপায় আছে', বললো বিদল, 'ওদের বাহিনীর মধ্যভাগে ঠিক সম্মুখে আছে নারীবাহিনী। ওটাই ওদের দুর্বলতা।'

'কিন্তু সেই বাহিনীর সামনেও তো আছে একসারি হাতি।'

'তা আছে। কিন্তু এক লক্ষ হাতি সমগ্র সম্মুখভাগে ছড়িয়ে আছে। হিসেব কষে দেখুন, তার মানে ওদের ব্যূহের কেন্দ্রে দশ হাজারের বেশি হাতি নেই। আমরা আমাদের সম্পূর্ণ বাহিনীকে শূলব্যূহে সজ্জিত করে যদি ওদের কেন্দ্রভাগে আক্রমণ চালাই, তাহলে দ্রুত হস্তীবাহিনীর স্তর ভেদ করে ওদের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবো।'

'কিন্তু আমাদের বাহিনীর দুই পার্শ্বভাগ সম্পূর্ণ অরক্ষিত থাকবে', বললো মহিষাসুর, 'ওদের ত্রিশূলব্যূহের দুই পার্শ্ববাহু পিষে মারবে আমাদের সৈন্যদের।'

'যদি না তার আগেই ওদের নারীবাহিনীকে আমরা বন্দি করে ফেলতে পারি', বললো বিদল।

'ঠিক আছে। কিন্তু নারীবাহিনীর পেছনেই আছে দেবতাদের বাহিনী। ওরা যাতে নারীবাহিনীর সহায়তা করতে আসতে না পারে, সে ব্যবস্থা করতে ভুলো না'। বললো মহিষাসুর।

দেখতে দেখতে মুখোমুখি এসে পড়লো দুই সেনাবাহিনী। মহিষ ও হস্তীর সংঘর্ষে কেঁপে উঠলো ধরিত্রী। রণহস্তীর পায়ের তলায় থেঁতলে গেল অসংখ্য রণমহিষের দেহ। মোষের শিঙের আক্রমণে ফালাফালা হলো অতিকায় বহু হাতির দেহ। ব্রঙ্গাহ্নদিদের বিষ তিরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে ধূলিশয্যা নিল অসংখ্য দানবসেনা। কিন্তু মহাসেনাপতি বিদলের পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। দানবদের শৃঙ্খলাবদ্ধতা ছিল প্রশ্নাতীত। অগণিত সংখ্যায় মহিষ ব্রঙ্গাহ্নদিদের হস্তীবাহিনীর একই বিন্দুতে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে গেল। এক প্রহরের মধ্যে দেখা গেল, হস্তীবাহিনীর ব্যূহস্তরে ক্ষুদ্র এক ছিদ্র দেখা দিয়েছে। সেই ছিদ্র দিয়ে বন্যার জলের মতো দানবসেনা ঢুকতে শুরু করলো ত্রিশূলব্যূহের মধ্যে। দানববাহিনীর সেই অগ্রণী সেনার নেতৃত্ব দিচ্ছে মহাসেনাপতি বিদল স্বয়ং। ঠিক একই সময় বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠলো মাটি। দেখতে দেখতে চামুণ্ডাবাহিনী ও দেববাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে এক প্রলয়ংকর অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠলো। আগুনের সে বেড়াজালের পেছনে আটকা পড়লো দেবতারা। প্রমাদ গুনলো রুদ্র। কটিবন্ধ থেকে পিণাক বার করে তাতে দিল ফুৎকার। বাতাসে ভেসে সেই সংকেত পৌঁছে গেল অন্য বাহিনীগুলির কাছে। ব্যূহের অন্তিম স্তরের খর্বাকৃতি হস্তীসেনা দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে দানববাহিনীর পশ্চাদভাগের দিকে যাত্রা করলো। একই সঙ্গে শিব ও বিষ্ণুর বাহিনীদ্বয় দ্রুত ধাবমান হলো দানবদের দিকে। দানববাহিনীকে দু'পাশ থেকে পিষে ফেলতে। কিন্তু দানবদের মনে প্রাণের ভয় নেই। তারা নিশ্চিত লক্ষ্যে এগিয়ে চলল চামুণ্ডাবাহিনীর দিকে। চিন্তার তরঙ্গে বার্তালাপ হল রুদ্র ও হরির।

'পরিস্থিতি ভালো ঠেকছে না', বললো রুদ্র 'আমার হিসেব অনুসারে আগামী কিছুক্ষণের মধ্যেই দানববাহিনী চামুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। ওদিকে দেববাহিনী অগ্নিবলয়ের পেছনে আটকা পড়েছে। তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য আশা করা যাবে না আপাতত।'

'দানবরা সংখ্যায় অগণিত', বললো হরি 'চামুণ্ডাবাহিনীর তুলনায় ওদের সংখ্যার অনুপাত একে একশো। সরাসরি সংঘর্ষে চামুণ্ডারা ধুলোর মতো উড়ে যাবে।'

'ওদের বাঁচানোর জন্য কিছু একটা করা দরকার। যেভাবেই

হোক দানবব্যূহের অভিমুখ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। তার সঙ্গেই চামুণ্ডাবাহিনীর কাছে দ্রুত সাহায্য পৌঁছে দিতে হবে।'

'ঠিক আছে', বললো হরি 'আমি গরুড়ের সাহায্যে দ্রুত পৌঁছে যেতে পারি ওদের কাছে। আশাকরি আকাশ থেকে অস্ত্রবর্ষণ করে দানবদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবো কিছুক্ষণ।'

'ততক্ষণে আমি দানববাহিনীর ব্যূহকে পেছনদিক থেকে আড়াআড়িভাবে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করি। যদি দানবদের ব্যূহের পেছনদিকে যথেষ্ট পরিমাণে লোকক্ষয় করতে পারি, তবে হয়তো দানবরা উত্তেজিত হয়ে ব্যূহের অভিমুখ ঘুরিয়ে দিতে পারে', বললো রুদ্র।

মহাবলী বৃষে আসীন হয়ে রুদ্র ঝড়ের মতো ঢুকে পড়লো শত্রুব্যূহর মধ্যে। সঙ্গে বৃষে আসীন এক সহস্র প্রেতকল্প উগ্রচণ্ডা সাধক। বৃষশৃঙ্গের আঘাতে ইতস্তত ছিঠকে পড়তে লাগলো আরোহীসহ মহিষের দেহ। রুদ্রর ত্রিশূল চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো, শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদ করতে লাগলো। মৃতদেহের পাহাড় জমলো রুদ্রর পথের দুপাশে। দানবব্যূহের পশ্চাদভাগে সৈন্যসংখ্যা কমতে লাগলো। তবু দানবদের আক্রমণের অভিমুখ পরিবর্তন করা গেল না। এইসময় শিব ও বিষ্ণুর বাহিনীদ্বয় দানবদের সন্নিকটে পৌঁছে সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু করলো। তিনদিক থেকে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ অগ্রাহ্য করেই মহাসেনাপতি বিদলের নেতৃত্বে দানববাহিনীর শূলব্যূহ স্থির অচঞ্চল লক্ষ্যে এগিয়ে চলল। বিদল দেখতে পেল, দূরে দেখা যাচ্ছে নারীবাহিনীর অগ্রভাগকে। অদ্ভুত এক সুরে শঙ্খে ফুৎকার দিল বিদল। দেখতে দেখতে শূলব্যূহের অগ্রভাগ ক্রৌঞ্চব্যূহে রূপান্তরিত হলো।

'নারী! হাঃ! নারী আবার কী যুদ্ধ করবে। আমাদের দেখে এক্ষুনি ওরা পালাতে শুরু করবে। না, পালাতে দেব না ওদের কাউকেই। এই ক্রৌঞ্চব্যূহ দিয়ে ঘিরে ফেলবো ওদের সবাইকে। অর্ধপ্রহরের মধ্যেই ওদের বন্দিনী করে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেব। তারপর ওদের নেত্রীটিকে ভেট দেব মহিষাসুরকে।'

কয়েক মুহূর্ত পার হয়ে গেল। অবাক চোখে আগুয়ান নারীবাহিনীর দিকে তাকিয়ে দেখল বিদল। পালানোর নাম নেই, উল্টে ক্রমশই এগিয়ে আসছে ওরা। ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশপথে মহাকায় গরুড়পক্ষীতে আসীন হয়ে উপস্থিত হলো হরি। চামুণ্ডাবাহিনী ও দানবসেনার মাঝামাঝি অবস্থান নিল। আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি শুরু করলো হরির সুদর্শন চক্র। দানবসেনার শক্তিক্ষয় শুরু হলো সামনে দিক থেকেও। থমকে দাঁড়ালো দানবদের অগ্রগতি। পরিস্থিতির পরিবর্তন দ্রুত বুঝে নিল বিদল। সেনাদলের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললো,

'অসুর সেনাগণ! ওই দ্যাখো, জয় তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরোয়া করো না, কে মরলো আর কে বাঁচলো। যে মারা যাবে, অসু তাদের দিব্যাঙ্গনা দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। যে বেঁচে থাকবে সে বলপূর্বক অধিকার করবে ব্রঙ্গার পৌত্তলিক নারীদের। ওই দ্যাখো, সামনে কত সুন্দরী দাঁড়িয়ে। ওদের অস্ত্র দেখে ভয় পেয়ো না। ওসব অস্ত্র শুধু প্রদর্শনের জন্য। ইতিহাসে কবে কখন নারীরা পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে জিতেছে? যাও, বলপূর্বক অঙ্কশায়িনী করো ওদের। শুধু দলনেত্রীটিকে ছেড়ে দাও, ওকে বন্দি করে মহিষাসুরকে ভেট করবো।'

বিদলের আহ্বানে কাজ হলো। কামতাড়নার বশবর্তী হয়ে অসুসরা আবার এগোতে শুরু করলো। আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি আড়াল করতে নিজেদের আহত ও মৃত সাথীদের দেহ ব্যবহার করলো। বহু অসুর অগ্নিবৃষ্টিতে মারা গেল, তবু ওদের অগ্রগতি থামলো না। ব্যূহরচনা অটুট রইলো।

চিক্কার পিঠে সওয়ার দুর্গা দেখলো, দূরে দানববাহিনী ক্রৌঞ্চব্যূহে সজ্জিত হয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। ব্যূহের সম্মুখভাগের কেন্দ্রে ক্রৌঞ্চপক্ষীর আগ্রাসী ঠোঁটের জায়গায় রয়েছে রথে সওয়ার সেনাপতি চিক্ষুর। বাহিনীর কেন্দ্রে বক্ষস্থলে রয়েছে মহাকায় মহিষে আসীন মহাসেনাপতি বিদল।

'ক্রৌঞ্চর ডানচোখে রয়েছে হাতিতে চড়ে দানব চামর', দূরবীন চোখে দিয়ে বললো ভুবনেশ্বরী, 'বাঁ চোখে রয়েছে মহিষে সওয়ার উদগ্র। ডান ডানায় রয়েছে অসিলোমা, তাম্র ও বাস্কল। বাঁ ডানায় রয়েছে অন্ধক, পরিবারিত ও বিড়ালাক্ষ। সবাই মহিষে সওয়ার।'

'ক্রৌঞ্চব্যূহ ব্যবহার হয় ঝটিকা আক্রমণের জন্য', বললো দুর্গা 'তার মানে দ্রুত আক্রমণে যেতে চাইছে দানবরা?'

'তাই মনে হচ্ছে' বললো ভুবনেশ্বরী।

'ভাবছো জয় খুব সহজ হবে। হুঃ।' এই বলে দুর্গা শঙ্খ হাতে তুলে নিল। সে শঙ্খ বেজে উঠলো বিশেষ এক সুরে। চামুণ্ডাবাহিনীর মধ্যে সঞ্চারণ শুরু হলো। দ্রুত সে বাহিনী পরিবর্তিত হলো গরুড়ব্যূহে। দুর্গা সেই গরুড়ের ঠোঁট। বগলামুখী ও ভৈরবী দুই চোখ। কালী ও ছিন্নমস্তা দুই ডানা।

বিদল দেখতে পেল, সিংহবাহিনী দলনেত্রী ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণ করতে আসছে, ভাবলো বিদল। বাহনকে সংকেত দিল, ব্যূহ ছেড়ে এগিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই বিদল দেখল, যেন এক ঝলক সূর্যালোক ঝলসে উঠলো। দেখা দিল হলুদবস্ত্র পরিধান এক নারী, রং তার দ্বিপ্রহরের সূর্যের মতো আগুন ঝরানো, হাতে উদ্যত ধনুর্বাণ।

একটি সুদীর্ঘ তির মরুৎবেগে উড়ে এসে ওর লৌহজালিকে বিদ্ধ করল। বর্ম ভেদ করে হুল ফোটালো চামড়ার অন্তর্বাসে। কোনো ক্ষতি হলো না বিদলের।

'এই তোদের আক্রমণ? ছোঃ!' এই বলে বিদল তিরটাকে লৌহজালিক থেকে টেনে বার করার চেষ্টা করল। পরমুহূর্তেই তিরটার মধ্যে ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ হল। আর কিছু বলার বা ভাবার সুযোগ পেল না বিদল। বিস্ফোরণে উড়ে গেল ওর হাত, বক্ষপিঞ্জর সহ অর্ধেক শরীরটা।

রাশি রাশি শাবল, ভিন্দিপাল, মুষল, খড়্গ, কুঠার, পাশ ও পট্টিশ উড়ে এল দানবদের দিক থেকে। বগলামুখীর নির্দেশে একরাশ তির জ্যামুক্ত হলো। দানবদের ছোঁড়া অস্ত্রগুলো লক্ষ্যভ্রষ্টহলো সেই তিরের আঘাতে, বিস্ফোরিত হলো আকাশে। পরমুহূর্তেই আরেকদল তির জ্যামুক্ত হলো চামুণ্ডাদের ধনুক থেকে। অসুরদের অগ্রগামী স্তর সজারুসদৃশ সর্বাঙ্গ বাণবিদ্ধ হয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করল। এই সুযোগে হা-হা করে অট্টহাসি হাসতে হাসতে বিবিধ হিংস্র বন্যজন্তুতে আরোহী চামুণ্ডাবাহিনী ঈগলের ভঙ্গিতে ঈগলের মতোই ঝটিকাগতিতে ঝাঁপ দিল দানববাহিনীর ওপর। তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো দানব ও চামুণ্ডাবাহিনীর মধ্যে। মেয়েগুলো হাসছে কেন? ভয়ে কি এদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে? অবাক হয়েও তা নিয়ে বেশি ভাবতে পারলো না দানবরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দানবরা বুঝতে পারলো, মেয়েদের দুর্বল ভেবে তড়িঘড়ি সর্বশক্তি লাগিয়ে এদিকে আক্রমণ করাটা ঠিক হয়নি। এ মেয়েরা প্রাণ দেবে, কিন্তু বন্দি হবে না। আর প্রাণ দেওয়ার আগে হাসতে হাসতে দশজন দানবের প্রাণ নেবে। এ মেয়েদের দানবদের ওপর এত জাতক্রোধ কিসের? দানবদের অনিষ্ট করে যেন ভূমানন্দ লাভ করছে এরা। মেয়েদের হাতে প্রাণ দিলে পরমপিতা অসু কী আদৌ মৃত্যুর পর পুরস্কৃত করবেন? সন্দেহ জেগে গেল অনেকের মনেই।

দুর্গা দেখল, সংখ্যার অনুপাতে দানবরা অনেকটা এগিয়ে। চামুণ্ডাবাহিনী সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ যুদ্ধে অন্তে জয় হলেও অসংখ্য নারীযোদ্ধা যে বীরগতিপ্রাপ্ত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। দুর্গার নির্দেশে এগিয়ে এলো ধূমাবতী। হঠাৎ দেখা গেল, রাশি রাশি ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে রণক্ষেত্র। শত্রু-মিত্র চেনা যাচ্ছে না। সেই কুজ্ঝটিকার আড়াল নিয়ে নারীবাহিনী উপর্যুপরি প্রহার চালালো দানবদের ওপর। চিঙ্কা দাবাগ্নির মতো অসুর সৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলো। চামুণ্ডাবাহিনীর ত্রিশূল, গদা, খড়্গের আঘাতে বহু অসুর বধ হলো। কেউ খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হলো, কেউ গদাপ্রহারে বিমর্দিত হয়ে ভূতলে নিপাতিত হলো। কেউ বা চামুণ্ডাবাহিনীর বাহনদের উদরসাৎ হয়ে প্রাণত্যাগ করলো। কেউ মুষলে আহত হয়ে রক্তবমন করতে লাগলো, কেউ বা শূলাঘাতে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হয়ে ভূপতিত হলো। কারোর বাহু ছিন্ন হলো, কারোর বা ঘাড় ভাঙলো। কেউ মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি খেল, কারোর বা দেহের মধ্যভাগ বিদীর্ণ হলো। তবু দানবরা লড়াইয়ের ময়দান ছাড়ল না। বহু দানব ছিন্নজঙ্ঘা, একবাহু, একচক্ষু, একপদ হয়েও লড়াই চালিয়ে গেল। চিঙ্কা মহানন্দে কামড়ে তাদের দেহ থেকে প্রাণবায়ু টেনে বার করতে লাগলো। ভগ্ন রথ, হস্তী, মহিষ, অশ্ব ও অসুরদের মৃতদেহের পাহাড় তৈরি হলো। রক্তের নদী বয়ে গেল। কুহেলীর আবরণ ফিকে হয়ে এলে দেখা গেল দানবদের ব্যূহের সম্মুখভাগ প্রভূত ক্ষতির শিকার হয়েছে।

দানব সেনাপতি চিক্ষুর ক্রোধে রক্তজবার মতো লাল হয়ে নিজের ধনুক তুলে নিল হাতে। সারথিকে আদেশ দিল রথ দুর্গার দিকে নিয়ে যেতে। মুহুর্মুহু বাণবৃষ্টি করতে লাগলো চিক্ষুরের ধনুক। চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলল সেই তিরবৃষ্টি। সামনে যে পড়ল, ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। দ্রুত চিক্ষুর পৌঁছে গেল দুর্গার সামনে। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে দুর্গার ধনুক থেকে পাল্টা শরবৃষ্টি নির্গত হলো। সেই শরবৃষ্টি ঝড়ের মুখে বাদলের মেঘের মতো উড়িয়ে দিল চিক্ষুরের আক্রমণকে। নিরবচ্ছিন্ন শরাঘাতে চিক্ষুরের রথের অশ্ব ও সারথিকে ভূলুণ্ঠিত করলো দুর্গা। চিক্ষুরের রথধ্বজা ছিন্ন হলো, ধনুক ভেঙে দু-টুকরো হলো। বাণবিদ্ধ হয়ে মাটিতে ছিটকে পড়লো চিক্ষুর। ছিন্নধনু, রথশূন্য, অশ্বহীন, সারথিবিহীন ও আহত হয়েও চিক্ষুর লড়াই ছাড়লো না। খড়্গ ও ঢাল তুলে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে এলো। এক লাফ দিয়ে পড়লো চিঙ্কার ঘাড়ে। যুগপৎ ঢাল দিয়ে চিঙ্কার মাথায় আঘাত করলো, খড়্গ দিয়ে আঘাত হানলো দুর্গার ওপর। দুর্গার বাম বাহুমূলে লেগে খড়্গ ভেঙে দু-টুকরো হলো। আর্তনাদ করে চিঙ্কা গড়িয়ে পড়লো মাটিতে, চিঙ্কার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো দুর্গা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো ওর বামবাহু থেকে। যন্ত্রণায় অবশ হয়ে এল শরীর। দুর্গাকে ভূপতিত দেখে উৎসাহে চিক্ষুর নিজের ভগ্নরথ থেকে তুলে নিল মহাকায় এক শূল, ছুঁড়ে দিল দুর্গার দিকে। মরুৎবেগে দৌড়ে এলো কালী ও ছিন্নমস্তা। ছিন্নমস্তা নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করলো দুর্গাকে, কালী ওর হাতের শূল ছুঁড়ে দিল আকাশে। সেই শূল নিভুল লক্ষ্যে চিক্ষুর উড়ন্ত শূলকে ভেঙে দু-টুকরো করে চিক্ষুরের বক্ষপিঞ্জর বিদ্ধ করলো।

এগিয়ে এলো চামর, হাতির পিঠে চড়ে। দ্রুত পরিস্থিতির

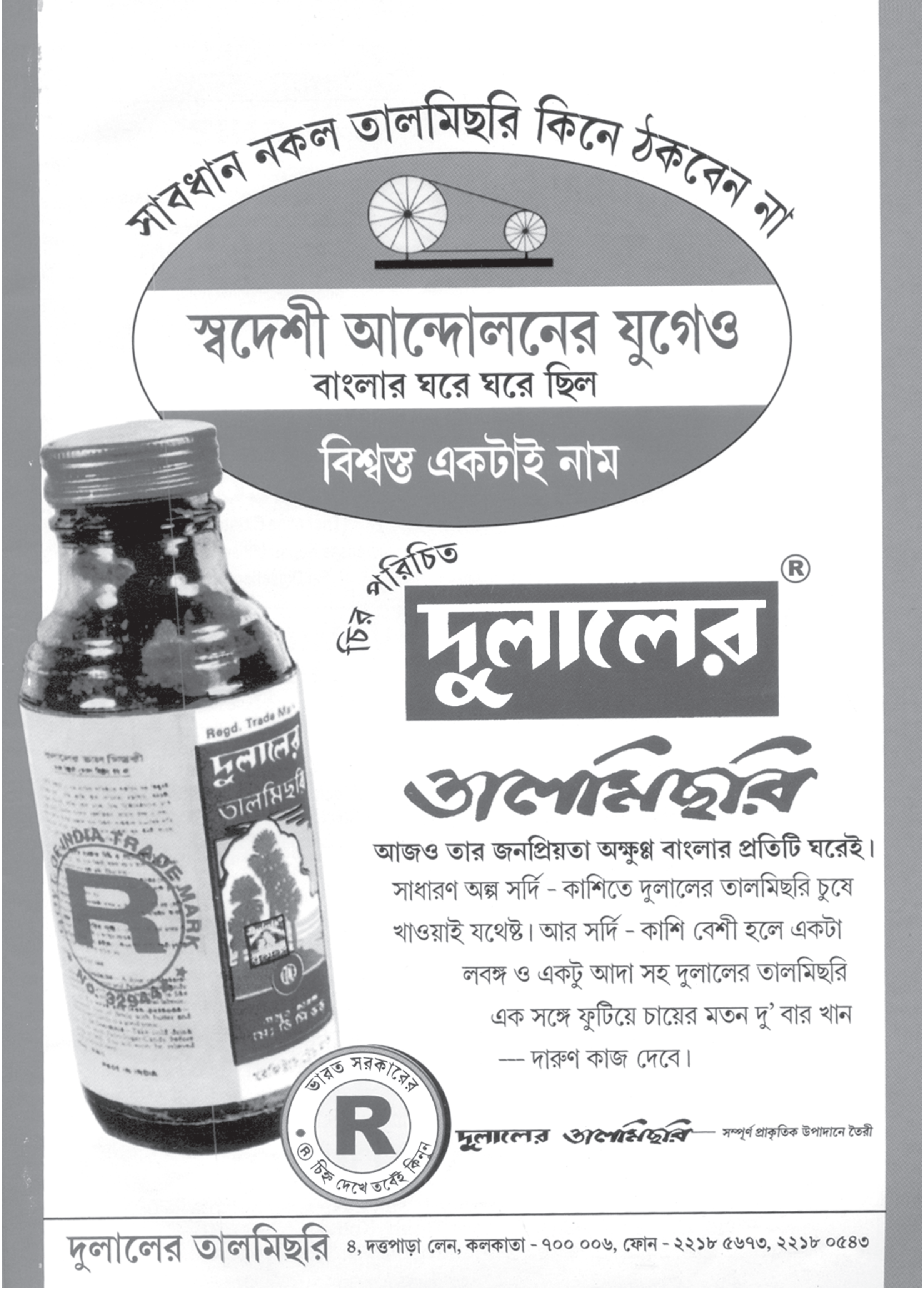
সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

পর্যালোচনা করলো ও। এই যুদ্ধে আদৌ হার হতে পারে, সেই সম্ভাবনাটা কিছুক্ষণ আগেও মনের মধ্যে জাগেনি। মেয়েরা আবার কী লড়াই করবে! কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, অনেক অঘটনই ঘটতে পারে আজ। তবু যদি দলনেত্রী ওই মেয়েটিকে মেরে ফেলা যায়, তবে হয়তো বা জিতে ঘরে ফেরা সম্ভব আজ। চামর দেখলো, আহত দুর্গা এখনো মাটিতে পড়ে আছে। চামর ওর তূণীর থেকে বার করে আনলো শক্তিঅস্ত্র। ব্রহ্মা-সম্প্রদায়ের তৈরি এই তিরের মাথা ক্ষুরধার হীরকখণ্ড দিয়ে তৈরি। কোনো বর্ম চর্ম লৌহজালিক একে প্রতিরোধ করতে পারে না। মাথার পেছনে আছে একটুকরো তেজস্ক্রিয় ধাতব। শরীরের বিন্দুমাত্র সংস্পর্শে এলেও সে ধাতব দ্রুত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ডেকে আনবে। কোনো বৈদ্যর ক্ষমতা নেই সেই তেজস্ক্রিয় বিষ শরীর থেকে বের করে রোগীকে বাঁচাতে পারে। যুদ্ধের আগে মহিষাসুর এই অস্ত্র চামরকে দিয়ে বলেছিল, চরম পরিস্থিতি হলে ব্যবহার করতে। তা, এটা যদি চরম পরিস্থিতি না হয়, তাহলে কোনটা চরম পরিস্থিতি? এই ভেবে ধনুকে জ্যা রোপণ করে দুর্গার ওপর শক্তিঅস্ত্র নিক্ষেপ করলো চামর। বহু বছরের প্রশিক্ষিত মন দুর্গাকে বলে দিল, বিপদ ধেয়ে আসছে। মুহূর্তে খড়্গ তুলে নিলো দুর্গা, প্রচণ্ডবেগে ঘোরাতে লাগলো। খড়্গের লোলুপ জিহ্বা দুর্গার চারপাশে দুর্ভেদ্য এক বর্ম সৃষ্টি করলো। পরমুহূর্তেই সেই খড়্গের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো শক্তিঅস্ত্রের। শক্তিঅস্ত্র ভূপতিত হলো, ভেঙে দু-টুকরো হলো দুর্গার খড়্গ। নিজের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ চামর এবার তুলে নিলো শূল, সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারলো দুর্গার দিকে। চোখের পলক ফেলতে যতটুকু সময় লাগে, তারমধ্যে দুর্গা হাতে তুলে নিল ধনুক। জ্যামুক্ত বাণের আঘাতে চামরের শূল ভূপতিত হলো। হতাশ ও ক্রুদ্ধ চামর এবার কোমর থেকে তরবারি বার করলো। দুর্গাকে লক্ষ্য করে সে তরবারি ছুঁড়তে যাবে, এমন সময় চিঙ্কা একলাফে চামরের বাহন হাতির মাথার ওপর চড়ে বসলো। চিঙ্কার নখদাঁতের আঘাতে রক্তাক্ত হলো হাতি, অন্ধ হয়ে পাগলের মতো দৌড়াতে লাগলো। আরেক লাফে চিঙ্কা চামরের ঘাড়ে গিয়ে পড়লো। ভীষণ মল্লযুদ্ধ শুরু হলো চামরের সঙ্গে দুর্গার বাহনের। মরণপাশে আবদ্ধ হয়ে হাতির পিঠ থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল দুজনে, যুদ্ধ তবু চলতে লাগলো। শেষমেশ চিঙ্কা ঝটকা দিয়ে চামরের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে লাফিয়ে উঠল আকাশে। অনেকটা উঁচু লাফিয়ে বিপুল গতিবেগে নির্ভুল লক্ষ্যে চামরের মাথার ওপর গিয়ে পড়ল। শিরস্ত্রাণ ভেঙে দু-টুকরো হলো, চামরের মাথা থেঁতলে গেল। থাবার আরেক আঘাতে সেই মাথা বিচ্ছিন্ন হলো দেহ থেকে।

ক্রৌঞ্চব্যূহের অন্য চোখ থেকে এগিয়ে এলো উদগ্র, শূন্যস্থান পূরণ করতে। দুর্গা দেখল, উদ্যত শূল হাতে মহিষে সওয়ার উদগ্র এগিয়ে আসছে ওরই দিকে। দৌড়ে এলো ভৈরবী। পাশেই ছিল এক ঝাঁকড়া বাবলা গাছ। একটানে শিকড়সুদ্ধু সে গাছ উপড়ে আনলো, ছুঁড়ে দিল উদগ্রকে লক্ষ্য করে। বাতাসে ঝড় তুলে সেই মহীরুহ উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল উদগ্রর মুখের ওপর। বাবলার কাঁটা চোখে ঢুকে অন্ধ হলো উদগ্র। তার বাহন ভয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়োতে শুরু করলো। উদগ্র গড়িয়ে পড়ল পিঠ থেকে, বাহনের পায়ের দলায় পিষে মারা গেল।

ক্রৌঞ্চব্যূহের ঠোঁট ও চোখ বিধ্বস্ত। গলার অংশ অনাবৃত। ব্যূহের দুই ডানা এগিয়ে আসার আগেই আবার ধূমাবতীর কুয়াশায় ঢেকে গেল যুদ্ধক্ষেত্র। এবার দানবব্যূহের কেন্দ্রে সরাসরি আক্রমণ চালালো চামুণ্ডারা। ব্রহ্মার মন্ত্রঃপুত দিব্যাস্ত্রের আগুনে ঝলসে উঠলো মধ্যভারতের কবোষ্ণ বাতাস। শয়ে শয়ে অসুর পুড়ে মরতে লাগলো। প্রাণভয়ে প্রশিক্ষণ ভুলে অসুরদের বাহনরা ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি শুরু করলো। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগলো দানবরা। ঠিক সেইসময় দেখা গেল, দানবব্যূহের অন্তভাগ চিরে শত্রুসংহার করতে করতে কালান্তক ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে রুদ্র। অন্তভাগ থেকে অগ্রভাগ, দানবদের ব্যূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে।

'বাঃ!' দুর্গার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো রুদ্র, 'কারোর সাহায্য ছাড়াই তুমি দিব্যি সামলে দিয়েছ। আমি মিছেই দুশ্চিন্তা করছিলাম। কিন্তু তোমার এ কী অবস্থা হয়েছে?'

দুর্গার বাম বাহুমূল শক্ত করে ধরল রুদ্র। থরথর করে কেঁপে উঠল দুর্গা। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, সারা শরীর অবশ হয়ে এল। তবু মনে হচ্ছিল, এই সময়টা যেন শেষ না হয়। কটিবন্ধ থেকে একরাশ লতাপাতা বার করে তাই দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিল রুদ্র। সে পাতার উগ্র গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল দুর্গার।

'কী এটা?' বললো দুর্গা।

'গঞ্জিকা, এতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে', বললো মহাদেব রুদ্র, 'ক্ষতস্থান বিষমুক্তও হবে।' দুর্গার হাতের কাঁপন, ওর মুখের

রক্তিম আভা নজর এড়ালো না ওর।

'কিন্তু মহিষ কোথায়?' ক্ষণিকের বিহ্বলতা সামলে উঠে দুর্গার উৎকণ্ঠ প্রশ্ন।

আকাশ থেকে নেমে এল হরি। দুর্গার একই প্রশ্ন তাকেও। মহিষের সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত। কেউ নিহত, কেউ বা পলাতক। তাহলে মহিষ কোথায় গেল?

'আমি দেখছি।' এই বলে আবার আকাশে উড়ল হরি।

আগুনের বাধা ডিঙিয়ে পৌঁছাতে অনেকটা সময় লাগলো দেবসেনার, কিন্তু শেষপর্যন্ত এসে পৌঁছালো। লজ্জায় অধোবদন হয়ে ইন্দ্র এগিয়ে এল দুর্গার দিকে।

'আপনারা একাই লড়লেন লড়াইটা। আমরা কোনো সাহায্যই করতে পারলাম না।'

'সেটা তোমার দোষ নয়', বললো দুর্গা, 'তবে সাহায্য করার সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি।'

'কী করতে হবে, আদেশ করুন'। করজোড়ে বললো ইন্দ্র।

'ওই দ্যাখো, তারা হিমশিম খাচ্ছে আহতদের নিয়ে', বললো দুর্গা, 'দ্রুত কয়েকজন বৈদ্য দরকার।'

'নিশ্চয়ই, আমি এখনই অশ্বিনীকুমারদের বলছি, তারাদেবীকে সহায়তা করার জন্য। ওদের সঙ্গে বৈদ্যদের একটি দল রয়েছে। সব ঠিক হয়ে যাবে, আহতদের নিয়ে আপনি কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না।'

'আরেকটা জরুরি কথা', বললো দুগা 'এখানে শক্তিঅস্ত্র ব্যবহার করেছে অসুররা। আপাতত তারা জায়গাটাকে পলাণ্ড দিয়ে ঢেকে রেখেছে। তেজস্ক্রিয়তা যাতে ভবিষ্যতে কারোর ক্ষতি না করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আমি এক্ষুনি দেখছি। আর কিছু করতে হবে?'

'মহিষ কোথায় লুকোলো, পারলে সেই খবরটা জোগাড় করো।' দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললো দুর্গা।

কয়েক প্রহর পার হয়ে গেল।

সন্ধ্যা নামছে মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ মালভূমিতে। দলে দলে পাখি বাসায় ফিরছে। ছাইছাই অন্ধকার ঘন হয়ে নীল রং ধরছে। এইমাত্র ফিরলো হরি। যুদ্ধক্ষেত্রে আঁতিপাতি করে খুঁজে ও মহিষকে কোথাও পায়নি।

'এমনও তো হতে পারে যে, মহিষ মারা গেছে?' বললো রুদ্র।

'তাহলে মৃতদেহটা গেল কোথায়?' বললো হরি, 'মৃতদেহ যতক্ষণ না দেখছি, ততক্ষণ মানতে পারছি না যে মহিষ মরেছে।'

'এত অসুরের মৃতদেহ পড়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে', বললো রুদ্র। 'হয়তো তাদের কারোর নীচে চাপা পড়েছে ওর মৃতদেহটা। তাছাড়া আর কী হতে পারে?'

'নাঃ!' বললো দুর্গা, 'আমি হরির সঙ্গে সহমত। না আঁচালে বিশ্বাস নেই। এতগুলো অসুরকে দেখলাম, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলাম, মহিষাসুরকে কই কোথাও দেখলাম না তো? যদি মারা গিয়ে থাকে, তবে ওকে মারলো কে? নাঃ, যতক্ষণ না ওর লাশ দেখছি, ততক্ষণ মহিষ জীবিত, এটাই মেনে চলা উচিত। কিন্তু একটা জলজ্যান্ত লোক সবার চোখের সামনে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেমালুম উবে গেল কী করে? এ কি সমবারি মায়া? গণসম্মোহন?'

যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর দূর থেকে দৃষ্টি রেখেছিল মহিষ। যখন দেখল দানববাহিনীর সঙ্গে বীরবিক্রমে লড়ে যাচ্ছে নারীবাহিনী, তখনই মনটা খুঁতখুঁত করে উঠেছিল। মুখে যাই বলুক, মহিষ আদতে ঘোর বাস্তববাদী। নারীযোদ্ধাদের বিক্রম ও দেখেছে ব্রঙ্গার যুদ্ধে। তাই বিদল যেরকম নারীযোদ্ধাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিল, তেমনটা মহিষ করতে পারেনি। কিন্তু দানবদের উত্থানের পেছনে রয়েছে বিধর্মী নারীদের প্রতি তাচ্ছিল্য, তাই বিদলকে কিছু বলতেও পারেনি তখন। তবে বিদলের যে সাহায্য প্রয়োজন, এটা দ্রুত বুঝে ফেলেছিল মহিষ।

তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট সৈন্যদের সংগ্রহ করে বিদলকে সাহায্য করার জন্য এগিয়েছিল মহিষাসুর। ত্রিশূলব্যূহের বেড়াজাল পেরিয়ে বিদলের সঙ্গে নারীসেনার যেখানে প্রলয়ংকরী যুদ্ধ চলছে, সেই স্থানের প্রায় ঢিলছোঁড়া দূরত্বে পৌঁছে গিয়েছিল মহিষ। এইসময় দেখল, কোনো এক মন্ত্রবলে ধোঁয়ায় ঢেকে গেল সবকিছু। তাপরই বিস্ফোরণের শব্দ, সঙ্গে বিদলের প্রাণান্ত আর্তনাদ। এ কোন অলৌকিক মায়া? আশঙ্কায় দুরুদুরু করে উঠলো মহিষাসুরের বুক। বাহনের রাশ টেনে ধরল, অনুগামী বাহিনী নিয়ে পিছিয়ে দাঁড়াল খানিকটা। দেখতে দেখতে মহিষাসুরের চোখের সামনেই দানবদের ব্যূহরচনা ভেঙে পড়ল, যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগলো তারা। পালিয়ে এত উদ্ধত, উগ্রস্ব, উগ্রবীর্য, আরও কত ধুরন্ধর দানবযোদ্ধা। পালাতে গিয়ে শুঙ্গভূমির খর্বাকৃতি হস্তীবাহিনীর হাতে সংহার হলো অধিকাংশ অসুর। সব শেষ। কী হবে এখন?

মহিষাসুরের যোদ্ধা-মন বলছিল, জয় পরাজয় যা হয় হোক, অন্তিম রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ে যেতে। কিন্তু অন্য একটা মন, যেটা ঘোর বাস্তববাদী, সেটা বলছিল, দানবদের মনোবল ভেঙে গেছে, তাই এ যুদ্ধে জেতা অসম্ভব। মিছিমিছি শক্তিক্ষয় না করে অবশিষ্ট শক্তিটুকুকে বাঁচিয়ে রাখা বেশি প্রয়োজন। তাই পালাতে হবে। কিন্তু কোথায়?

দেশের উত্তর-পশ্চিম জুড়ে দানবদের রাজত্ব। তাই সেখানেই যাওয়া উচিত। কিন্তু সেই রাজত্ব তো এই পাঁচলক্ষ মোষের শক্তির দাপটেই। সেই সেনাবাহিনীর সিংহভাগ বিনষ্ট হয়েছে, এখবর পৌঁছলে উত্তর-পশ্চিম জুড়ে বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী এই সুযোগেরই তো প্রতীক্ষায় রয়েছে বিষ্ণুর দলবল।

তাছাড়া, শত্রুরা নিশ্চয়ই ভাবছে, আমি উত্তর-পশ্চিমে পালাবো। তাদের ধোঁকা দিতে হলে উল্টোদিকে যাওয়াই শ্রেয়। দক্ষিণের রাজারা সরল, সাধাসিধে। বহুযুগ কোনো বড়সড় শত্রুর মুখোমুখি হয়নি ওরা। বিশেষ করে অসুরদের মতো প্রতিপক্ষ তো ওরা কোনোদিনই দেখেনি। বিন্ধ্যর উত্তরে কী ধরনের মাৎস্যন্যায় চলছে, তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই, তারা সেসব খবরও রাখে না। নিজেদের মধ্যে কখনো বন্ধুত্ব, কখনো বৈরিতা— এই নিয়ে মেতে আছে তারা। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গত ক'বছরে বহু সংখ্যক রক্তবীজকে গোপনে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে প্রেরণ করা গেছে। তারা বিভিন্ন ছোট ছোট জনপদে ঘাঁটি গেড়ে লোকচক্ষুর আড়ালে অসুধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়ে গেছে। দক্ষিণের রাজারা সেসব খেয়ালও করেনি। আজ তার সুফল পাওয়া যাবে। নিজের দূরদর্শিতার কথা ভেবে মনে মনে উল্লসিত হলো মহিষ।

বহু বছর ধরে মহিষ দক্ষিণাপথ আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছে। পরিকল্পনাই সার, এগোতে সাহস পায়নি। দণ্ডকারণ্যের পদে পদে বিষ্ণুর অঙ্গীভূত উপজাতিদের বসতি। তারা পাহারা দেয় বিন্ধ্যপর্বতের প্রতিটি গিরিপথ। তাদের নজর

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও

অভিনন্দন :—

AT

ANU

SAREES

13B, Digamber Jain Temple Road, (2nd Floor)
Chini Patti, Kolkata - 700 007
Phone : 2268 2234 / 35 / /36, Email : anusaree@gmail.com

এড়িয়ে নিজের বাহিনীকে অটুট রেখে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ দুঃসাধ্য কাজ। আজ চতুর্দিক থেক আসা বিপদের কালো মেঘ থেকে রক্ষা পেতে সেই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তটাই নিয়ে ফেলল মহিষাসুর। বাহনের মুখ দক্ষিণদিকে ঘোরালো, সঙ্গে সেনাধ্যক্ষ কৃষ্ণাঙ্গর অধীনে অবশিষ্ট দানবসেনা ও মহারথীরা। দলবল নিয়ে মহিষ চুপিসারে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ঢুকে পড়লো। নির্দেশ দিল কৃষ্ণাঙ্গকে, সেনার নিষ্ক্রমণের সব চিহ্ন যেন বিনষ্ট করতে করতে যায় ওরা। যাতে শত্রুরা পশ্চাদ্ধাবনের জন্য কোনো সূত্র না পায়।

শুরু হলো দণ্ডকারণ্যের এলাকা। দুর্গম এ জঙ্গলে পথ চিনে চলা দুষ্কর। সাহায্য করতে যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হলো একদল রক্তবীজ। তারাই গোলকধাঁধার মতো সেই জঙ্গলের গলিঘুঁজির মধ্যে দিয়ে দানবসেনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। কিছুদূর চলার পর সঙ্গে যোগ দিল একদল মহিষ-পালক, সঙ্গে তাদের মহিষরে পাল, জঙ্গলে চরতে বেরিয়েছে। তাদের সঙ্গে মিশে গেল মহিষাসুরের বাহিনী। বাইরে থেকে চেনার উপায় রইলো না, কে সৈনিক আর কে রোখাল। এখন সমস্যা শুধু রসদ নিয়ে। প্রতিটি সেনাবাহিনীর সঙ্গেই ক'দিন পথ চলার মতো রসদ থাকে। শুকনো চনক, গুড়। তারও বরাদ্দ অর্ধেক করে দিল সেনাধ্যক্ষ কৃষাঙ্গ। আধপেটা খেয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিরন্তর এগিয়ে চলল দানবের দল, দিনরাত। দু'দিন দু'রাত পথ চলার পর দূর থেকে শোনা গেল বহতা নদীর কুলুকুলু শব্দ। তার সঙ্গেই দূরে পাহাড়ের ফাঁকে দেখা গেল মন্দিরের স্বর্ণকলস, রক্তস্বর্ণবর্ণের ধ্বজায় বরুণের কুম্ভচিহ্ন। বিস্মৃতির আড়াল সরিয়ে একরাশ স্মৃতি মহিষের সচেতন মনের স্তরে এসে ঘা দিল। খুব ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে এসেছিল এখানে। অমরকণ্টক, নর্মদা নদীর উৎস। বরুণ সম্প্রদায়ের অতি পবিত্র তীর্থ। মাতামহী দনু এখানেই ওদের সামনে সজ্ঞানে জলসমাধি নিয়েছিলেন। মহামতী দনু, তার নামেই দানবজাতি। অথচ তিনি আমৃত্যু বরুণ-উপাসক ছিলেন। অসুবাদকে কখনোই স্বীকার করেননি। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তাহলে কী হতো? আজ জম্বুদ্বীপের প্রতিটি মানুষ দানবদের সমীহ করে চলে। এই সাফল্যে কী খুশি হতেন মাতামহী? নাকি এই যে দানবরা অসুবাদ গ্রহণ করে অসুর জয়যাত্রার সহায়ক হয়েছে, সেজন্য রুষ্ট হতেন। সেই অপরাধে মহিষকে কি উনি দানবজাতি থেকে বহিষ্কার করতেন? চরমশত্রু এই দুর্গা মেয়েটি ঠিক মাতামহীর মতো দেখতে। নাকি বিবেক এমনটা দেখাচ্ছে? এই বিবেক জিনিসটা উচ্চাকাঙ্ক্ষীর সবচেয়ে বড় শত্রু। পারলে নিজের বিবেকটাকে গলা টিপে হত্যা করতো মহিষ। যদি সম্ভব হতো। অন্যমনস্কভাবে মন্দিরচূড়ার উদ্দেশ্যে প্রণামের হাত উঠেছিল, সামলে নিল। সঙ্গীসাথীরা দেখে ফেললে লজ্জার ব্যাপার হবে। মন্দির ও তৎসংলগ্ন লোকালয় সন্তর্পণে এড়িয়ে যেতে বাহিনীকে আদেশ দিল মহিষ। এই অমরকণ্টকেই আরেকদল রক্তবীজ এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। অনেককাল রয়েছে তারা এই অঞ্চলে। বিন্ধ্যপর্বতের পরিসর শুরু হয়ে গেছে। পথে পড়লো একের পর এক সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম, শ্বাপদসঙ্কুল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। এই বিন্ধ্যাচল বিষ্ণুর খাস এলাকা। স্থানীয় রক্তবীজদের সহায়তা ছাড়া এ পথ পার হওয়া সম্ভব ছিল না। তারাই সবার চোখের আড়াল দিয়ে মহিষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। আরও পাঁচদিন নিরন্তর পথ চলার পর ওরা পৌঁছলো গোদাবরী নদীর তীরে।

গোদাবরী এখানে অনেকটা চওড়া, আর তেমনি খরস্রোতা। পার হওয়ার জন্য সাবধানে জলে নামতে গেছে, এমন সময় যোদ্ধার স্বভাবজাত সতর্কতা মহিষের পা টেনে ধরলো। সঠিক মুহূর্তে বাহিনীকে জলে নামতে বারণ করলো মহিষ। দেখল, শ'খানেক নৌকার এক নৌবহর পাল তুলে এগিয়ে চলেছে উজান বেয়ে। তাদের মাস্তুলের চূড়ায় বরুণদেবের পতাকা। নদীর তীরবর্তী ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে রইলো দানববাহিনী, যতক্ষণ না নৌবহরের শেষ নৌকাটিও দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। ক্রোধে ফুঁসছিল মহিষ। মনে পড়ছিল অসুর দিক্‌বিজয়ের সেই গৌরবময় দিনগুলোর কথা। লক্ষ মহিষের বাহিনী নিয়ে সিন্ধু ও গঙ্গার অববাহিকায় বসবাসকারী বরুণদেবের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল মহিষ। ইচ্ছে ছিল, গোদাবরী ও কৃষ্ণার বরুণদেরও সেভাবেই সমূলে ধ্বংস করার। সেসব স্বপ্ন ফিকে হয়ে গেল, দুর্গা নামের এই পৌত্তলিক মেয়েটির জন্য। প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছেটা নতুন করে ধমনীতে টগবগ করে ফুটতে লাগলো। লম্বা কয়েকটা শ্বাস নিয়ে জলে নামলো মহিষাসুর।

আরও পাঁচদিন পথ চলার পর কৃষ্ণানদী পার হলো অসুরবাহিনী। কৃষ্ণার দক্ষিণ পাড় থেকে জঙ্গল পাতলা হতে শুরু করেছে। একটা জনপদ চোখে পড়লো সেই পাড়ে।

'সম্রাট', সেনাধ্যক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ এসে বললো, 'সেনাবাহিনীর রসদ ফুরিয়ে গেছে। গত একদিন অভুক্ত অবস্থায় হাঁটছে সেনারা। আপনার প্রতি তাদের নিষ্ঠা সন্দেহাতীত। যতক্ষণ শরীরে প্রাণ আছে, ওরা আপনার সঙ্গেই থাকবে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? খাবারের ব্যবস্থা না হলে যে আর চলছে না।'

'নদীর ধারের ওই গ্রামটি থেকে কী রসদ সংগ্রহ করা যায়?' অন্যমনস্কভাবে বললো মহিষ।

‘তা হয়তো যায়’, বললো কৃষ্ণাঙ্গ, ‘কিন্তু বিনিময়ে ওদের কী দেবো আমরা? আমাদের স্বর্ণমুদ্রা নেবে এরা?’

‘না’, বললো পথপ্রদর্শক রক্তবীজ, ‘এরা স্বর্ণের বিনিময়ে কিছু দেবে না। স্বর্ণ এদের কাছে মূল্যহীন। তাছাড়া এইসব গ্রামবাসীদের মধ্যে বিষ্ণুর সংগঠন রয়েছে। এদের সঙ্গে বিনিময় করতে গেলে বিষ্ণুর কাছে সংবাদ পৌঁছে যেতে পারে।’

‘সৈনিকরা খালিপেটে মেরেকেটে আরও একদিন হাঁটতে পারবে। তারমধ্যে কী এমন কোনো জনপদ পড়বে, যেখান থেকে স্বর্ণের বিনিময়ে নিরাপদে রসদ সংগ্রহ করা যায়?’ বললো কৃষাঙ্গ।

‘না, না, তার কোনো দরকার নেই’, বললো মহিষ, ‘চুপিসারে গিয়ে গ্রাম আক্রমণ করো। যা দরকার, লুঠ করে নিয়ে এসো। শুধু একটা কথা মাথায় রেখো। প্রতিটি গ্রামবাসীকে হত্যা করে মৃতদেহ নদীর পাঁকে পুঁতে ফেলবে। বিষ্ণুকে খবর দেওয়ার জন্য কেউ যেন বেঁচে না থাকে। বাচ্চা বুড়ো কাউকে বাদ দেবে না।’

স্তম্ভিত কৃষাঙ্গ মহিষের দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার। এত নিষ্ঠুর কী কোনো মানুষ হতে পারে? পরক্ষণেই ভাবলো, মহিষ সাক্ষাৎ অসুর দূত। সে কী আর ভুল কিছু করতে পারে? হয়তো এই নিষ্ঠুরতার মধ্যেই পরমপিতা অসুর আশীর্বাণী লুক্কায়িত আছে।

পরবর্তী এক প্রহরে কৃষ্ণার জল লাল হয়ে গেল নিরীহ নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের রক্তে। বুভুক্ষু দানবের দল ঝাঁপিয়ে পড়লো শান্ত নির্বিরোধী গ্রামটির ওপর। গণহত্যার জান্তব বীভৎসতার যেন এক স্রোত বয়ে গেল। শিশু, বৃদ্ধ নরনারী কেউই বাদ গেল না। কামক্ষুধা ও উদরক্ষুধা দুইয়ের মধ্যেকার তফাত ভুলে গেল দানবরা। ধর্ষিতা হলো নারী ও শিশুরা, তাদের দেহ ছিঁড়েখুঁড়ে নরমাংসের স্বাদ নিল ক্ষুধিত দানবসেনা। সেনাধ্যক্ষ কৃষাঙ্গ শুধু পালিয়ে বেড়ালো, আড়ালে গিয়ে বমি করলো কয়েকবার।

আরও চারদিন পথ চলার পর মহিষাসুর পৌঁছলো কাবেরী নদীর উত্তর পাড়ে। অন্যপাড়ে মাথা তুলেছে খাড়াই উঁচু এক একলা পাহাড়। সেই পাহাড়কে দু'দিন থেকে বেড় দিয়ে রক্ষা করছে কাবেরী। অন্য দু'দিক ঘন জঙ্গলে ঢাকা। মহিষের অভিজ্ঞ চোখ বলে দিল, আশ্রয় নেওয়ার জন্য, নতুন করে বাহিনী সংগঠিত জন্য উপযুক্ত জায়গা এটি।

‘কে থাকে, ওই পাহাড়ে?’ বললো মহিষ।

‘বনবাসী উপজাতিরা থাকে’, বললো পথপ্রদর্শক রক্তবীজ, ‘সংখ্যায় তারা চার-পাঁচশো-র বেশি নয়। কাঞ্চীপুরমের রাজার এক দুর্গ আছে পাহাড়ের মাথায়। তবে সেই দুর্গে বহুকাল কেউ থাকে না। বনবাসীরাই পাহারা দেয় দুর্গ। পাহাড়টার এক প্রাচীন নাম রয়েছে, মহাবলাচল।’

‘উত্তম!’, বললো মহিষ, ‘বনবাসীদের মেরে ওই পাহাড় আর ওই দুর্গ অধিকার করতে হবে। আজ রাতের জন্য এখানেই বিশ্রাম নেওয়া যাক। ইতিমধ্যে তুমি স্থানীয় অসুরদের সঙ্গে যোগাযোগ করো। শ'খানেক লোক দরকার, যারা এই পাহাড়ের পথঘাট চেনে। তাহলেই আপাতত চলবে। আগামীকাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে পাহাড় আক্রমণ করা হবে।’

পরদিন ভোরবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে বাতাস অভিমুখ পরিবর্তন করলো। সেই বাতাসে ভর করে আগুনের হলকা ছড়িয়ে পড়লো মহাবলাচল পর্বতের আনাচে-কানাচে। আলোয় আলো হয়ে উঠলো গুহাকন্দর গিরিপথ। আগুনের তাপে জঙ্গল গাছপালা সব ঝলসে অঙ্গার হলো। ঝলসে পাথর হয়ে গেল নিদ্রাভিভূত বনবাসীরা, সপরিবারে। কেউ কেউ আগুনের ঘেরাটোপ পার হয়ে জঙ্গল থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেছিল। পাহাড় থেকে সমতলে নামবার প্রতিটি গিরিপথের মুখে ওঁত পেতে বসেছিল মহিষের সেনা। যে কেউই পালানোর চেষ্টা করলো, মারা পড়লো। দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যে শ্মশানের রূপ নিল মহাবলাচল। কৃষ্ণার মতোই কাবেরীও দানবদের নৃশংসতার নীরব সাক্ষী হয়ে রইল। মৃত সন্তানদের দুঃখে আকাশ থেকে অঝোরে বৃষ্টি নামলো সন্ধেবেলা। সারারাত ধরে সে বৃষ্টি চলল। পরদিন ভোরবেলা সদলবলে গিরিশীর্ষের দুর্গে প্রবেশ করল মহিষাসুর। সঙ্গে দানব-স্থপতি ময়।

‘এখানে আমার নতুন রাজধানী পত্তন করবো। আমার নামে সে রাজধানীর নাম রাখবো ‘মহীশূর’। এখান থেকেই দানবদের জয়যাত্রা নতুন করে শুরু হবে। তোমার কাজ হলো, আগামী এক পক্ষকালের মধ্যে দুর্গসহ এই পাহাড়টিকে অভেদ্য করে গড়ে তোলা। পারবে তো?’

‘এতবড় কাজের তুলনায় এক পক্ষকাল খুবই কম সময়’, বললো ময়দানব, ‘তবু চেষ্টা করবো।’

‘চেষ্টা নয়, করতেই হবে।’ বললো মহিষাসুর, ‘আমি যে দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে এসেছি, এই সংবাদ বেশিদিন চেপে রাখা যাবে না। খবর পেলেই দলবল নিয়ে ওই মেয়েটা এখানে এসে

হাজির হবে। আক্রমণে আক্রমণে নাস্তানাবুদ করবে আমাদের। আবার পালাতে হবে তখন। না, না। সে চলবে না। মনে রেখো, ঠিক এক পক্ষকাল পরে আমি নিজে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা পরিদর্শন করবো। কোনো খুঁত থাকলে তৎক্ষণাৎ তোমাকে শূলে চড়াবো। তাই আজ এক্ষুনি কাজে লেগে পড়ো। জনবল বা অর্থবল পেতে কোনো সমস্যা হবে না, যত চাও তত পাবে। কিন্তু কাজ নিখুঁত হওয়া চাই।'

সর্বশক্তি একজোট করে ময়দানব লেগে পড়লো মহীশূর দুর্গ নির্মাণ করতে। প্রতিটি গিরিবর্ত্মে মাথা তুললো উঁচু পাঁচিল। প্রতিটি গিরিসঙ্কটে গড়ে উঠলো সৈন্যদের লুকিয়ে থেকে যুদ্ধ করার উপযুক্ত সুরক্ষিত কক্ষ। দেখতে দেখতে যেন কোনো মন্ত্রবলে ঝলসানো সেই মহাবলাচল পর্বত রূপান্তরিত হলো ত্রিস্তরীয় এক অভেদ্য দুর্গে। সেই দুর্গে অধিষ্ঠান করে মহিষাসুর নতুন করে দানবসাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করল।

সিংহাসনে আসীন হয়েই মহিষ নজর দিল দাক্ষিণাত্যে নিজের শাসন নিরঙ্কুশ করতে। মহিষ দেখল, বহু প্রাচীন জনপদ রয়েছে এখানে। রাজারা মূলত সেখানেই থাকে, তার বাইরে সচরাচর বেরোয় না। সুউচ্চ প্রাচীর ও পরিখায় ঘেরা এইসব শহর এক এক করে জয় করতে হলে প্রভূত শক্তিক্ষয় হবে, বহু বছর কেটে যাবে। তাই মহিষ অন্য পথ নিল।

প্রাচীন ভারতবর্ষে মন্দিরগুলো ছিল সামাজিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কেন্দ্র। ঘরে টাকাপয়সা রাখা নিরাপদ নয়, তাই দেশের সাধারণ মানুষ তাদের সঞ্চিত ধনরাশি গচ্ছিল রাখতো স্থানীয় মন্দিরে। মন্দির কর্তৃপক্ষ সেই টাকা ধার দিত কারিগর সমিতিগুলোকে। সেই অর্থ ব্যবহার করে দেশের কারিগররা উৎকৃষ্ট সব পণ্য নির্মাণ করত। বণিকরা সেইসব পণ্যে জাহাজ বোঝাই করতো, মৌসুমি বায়ুতে ভর করে বাণিজ্যযাত্রায় বেরোতো। ভারতের শিল্পীদের তৈরি পণ্য বিদেশের বাজারে দেদার বিকোতো চড়া দামে। ফিরতি মৌসুমি বায়ুতে ভর করে বণিকরা দেশে ফিরত, সোনাদানায় জাহাজ ভর্তি করে। বছর ঘুরতে মন্দিরের ধার দেওয়া টাকা অনেকগুণ হয়ে ফেরত আসতো মন্দিরগুলোর কাছে। সেই লাভের টাকার অংশে মন্দিরের খরচ চলতো, সঙ্গে নানাবিধ সামাজিক উন্নয়ন হতো মন্দিরকে ঘিরে। নতুন মন্দির ও অতিথিশালা নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, অন্নসত্র ও জলসত্র চালানো, পাঠশালা চালানো— এইসবেরই উৎস ছিল সেই লাভের টাকা। বণিকদের কাছ থেকে লাভে টাকার আরেকটা অংশ যেত রাজার কাছে, রাজকর স্বরূপ। সাম্রজ্যের প্রতিরক্ষার খরচ মূলত সেভাবেই সংগৃহীত হতো। মন্দিরে রাশিরাশি ধনসম্পদ সঞ্চিত আছে, সেটা সবাই জানতো। তবু জঘন্যতম তস্করও মন্দিরের ধনরাশি লুঠ করার কথা স্বপ্নেও ভাবতো না। মন্দিরের টাকা জনসাধারণের টাকা, সে টাকা লুঠ করা তো মহাপাপ। কে সেধে সেই পাপ মাথায় নিতে চাইবে? মরিয়া হয়ে মহিষ সেই পথই বেছে নিলো। পাপের পরোয়া মহিষাসুরকে কোনোদিনই বিচলিত করেনি। ওর স্থির বিশ্বাস, ও যাই করে সেটা পুণ্য, কারণ সেটা ও করে অসুধর্মের উন্নতির জন্য।

ঝটিকা আক্রমণে একটার পর একটা মন্দির ধ্বংস করে তার ধনরাশি লুঠ করে মহিষাসুর জড়ো করতে লাগলো মহীশূরে। এর ফলে একদিকে যেমন মহিষ ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলো, অন্যদিকে হাহাকার পড়ে গেল গোটা দাক্ষিণাত্যে। অর্থতন্ত্র ধ্বসে পড়লো। কারিগরদের হাতে কাজ নেই, বণিকদের কাছে বিক্রি করার মতো পণ্য নেই। রাজকর অনাদায় পড়ে থাকছে। দাক্ষিণাত্যের একের পর এক রাজা সেনাবাহিনী পাঠালো মহীশূর আক্রমণ করতে। প্রতিটি অভিযানই ব্যর্থ হলো। যাত্রাপথে প্রতিটি বাহিনী অন্তর্ঘাতের শিকার হলো। রক্তবীজদের নেতৃত্বে স্থানীয় পুণ্যলোভাতুর নব্য অসুরের দল অন্তর্ঘাত চালালো নিজেরই রাজ্যের সৈনিকদের ওপর। যদি বা কোনো একটা দল মহীশূর এসে পৌঁছালো, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা হলো না তাদের। তার আগেই মারা পড়লো তারা। শুধু শক্তিক্ষয়ই সার, কেউ ভেদে করতে পারলো না সেই অভেদ্য কেল্লা। অর্থতন্ত্র ধসে পড়বার ফলে লক্ষ লক্ষ যুবক কর্মহীন হলো, টাকা ছড়িয়ে তাদের বশীভূত করে ফেললো মহিষ। দেখতে দেখতে দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে দাঁড়ালো মহিষাসুর। দাক্ষিণাত্যের সীমান্তে বসে ধীরে ধীরে নিজের ক্ষমতা বাড়াতে শুরু করলো উত্তর ভারতেও। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমে, যেখানে আগে থেকেই দানবদের প্রভুত্ব ছিল। গৃহযুদ্ধ শুরু হলো দেশজুড়ে। মহিষের অর্থবল লোকবল সবই বেশি। লাগাতার খণ্ডযুদ্ধে দেবতারা ক্রমশ কোণঠাসা হতে লাগলো ভারতবর্ষের সর্বত্র। বহু বছর কেটে গেল এইভাবে।

With the best Compliments from :

Phone : 2237-5919
2237-2090
2237-2822
Fax : 2237-0269
E-mail : kolkata@allindatpt.com
Web-site : www.allindiatpt.com

ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY
AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
ALL INDIA PACKERS & MOVERS

H.O. : 28, BLACK BURN LANE,
KOLKATA-700 012

Time Guaranteed delivery. Transporters for all over India, Marine type ISO Container trucks available. Bank-approved specialists in ODC Cargoes by heavy duty Trucks & Trailers. Specialists in packing of household goods & Transpotation. Branches & Association all over India.

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

মনমোহন চৌধুরী

মধ্যরাত। পাথরের দেওয়ালে স্থানে স্থানে কুলুঙ্গিতে প্রদীপ জ্বলছে। আলো-আঁধারের পুনরাবৃত্তি আলোছায়ায় ডোরাকাটা চাদর বিছিয়েছে ঘর জুড়ে। বিশাল এই ভূগর্ভস্থ কক্ষে বাইরে থেকে আলোবাতাস প্রবেশের পথ নেই। তবু টাটকা বাতাস বইছে মৃদুমন্দ। কীভাবে, তা ব্রঙ্গার স্থপতিরাই জানেন।

ব্রঙ্গার রাজপ্রসাদে গোপন মন্ত্রণাকক্ষে বৈঠক বসেছে। দুর্গার সঙ্গে রয়েছে কালী, মাতঙ্গী ও ভুবনেশ্বরী। রয়েছে দেবরাজ ইন্দ্র, সঙ্গে পবন। রয়েছে হরি ও রুদ্র। আর রয়েছে ব্রঙ্গারাজ দিব্যবল ও ব্রঙ্গার গুপ্তচর প্রধান বিরুপাক্ষ।

'এতগুলো বছর পার হয়ে গেল, তবু মহিষ আজও অধরা', বলছিল ক্ষুব্ধ দুর্গা, 'দু-দুবার আমরা মহিষকে যুদ্ধে হারিয়েছি। অথচ আজ সে আগের থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী। কোথায় ভুল হচ্ছে আমাদের?'

'উত্তরাপথের প্রতিটি রাজন্যবর্গকে আমি মিত্রতার প্রস্তাব পাঠিয়েছি', বললো দিব্যবল, 'মহিষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাদের আহ্বান জানিয়েছি। তারা কেউই আমার ডাকে সাড়া দেয়নি, মহিষের শক্তিকে তাদের এতটাই ভয়।'

'মধ্য ভারতের যুদ্ধের আগে আমরা উত্তরাপথের প্রতিটি জনপদে গিয়েছিলাম', বললো ভুবনেশ্বরী, 'বিদ্রোহের বার্তা পৌঁছে দিতে। ফলত, উত্তরাপথের প্রায় প্রতিটি বনাঞ্চল, প্রতিটি গ্রাম মহিষের শাসনকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু শহরগুলো আজও মহিষের করায়ত্ত। এর একটা কারণ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসুবাদের প্রভাব, গুরুকুলগুলোতে অসুবাদীদের প্রতিপত্তি। অন্য কারণটি হলো, উত্তরাপথের অধিকাংশ রাজাই ভীরু ও অক্ষম। মধ্যভারতের যুদ্ধে মহিষের হারের সুযোগ নিয়ে এরা নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করবে, এমনটাই আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু শরীরের শৃঙ্খলমোচন সহজ, মনের শৃঙ্খলমোচন কঠিন। এইসব রাজন্যবর্গ ভয়ে মরে আছে। নিজেদের বিলাসব্যসনটুকু জুটে গেলেই এরা খুশি। স্বাধীনতা এদের কাছে কোনো বিশেষ গুরুত্ব রাখে না। দানবরা চটে গেলে পাছে এদের আরামের ক্ষতি হয়, এই আশঙ্কাতেই এরা দানবদের বিরুদ্ধাচরণ করে না।'

'তা হবে নাই বা কেন?' বললো বিরুপাক্ষ, 'এদের অনেকেই কোনো না কোনো সময় মহিষের দাসত্ব স্বীকার করেছিল। সত্যিকারের স্বাধীনচেতা রাজারা সবাই বহুকাল আগেই অসুরদের হাতে খুন হয়েছে।'

'সমস্যাটাকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা দরকার', বললো হরি, 'আমরা ভাবছি, এইসব রাজারা কেন মহিষের বিরুদ্ধাচারণ করছে না, কেন এরা বিদ্রোহ করছে না। কিন্তু এইসব রাজ্যের প্রতিটিতেই বহুল সংখ্যায় রাজবিদ্রোহীরা রয়েছে। তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।'

'এইসব বিদ্রোহীরা অনেকেই স্বার্থসর্বস্ব ডাকাত বিশেষ', বললো ভুবনেশ্বরী, 'স্বার্থসিদ্ধির সামান্য সুযোগ পেলেই এরা মহিষের দলে ভিড়ে যাবে।'

'সবাই এরকমটা নয়', বললো হরি, 'এদের মধ্যে অনেকেই লোভে নয়, দেশজোড়া মাৎস্যান্যায়ের কারণে ডাকাত হয়েছে। দেশের সমস্যাটা এরা বোঝে। এরা ভুক্তভোগী। ডাকাতের দল গঠন করতে পেরেছে, তার মানে এদের মধ্যে নেতৃত্ব দেবার গুণ আছে। রাজাদের ওপর অযথা সময় নষ্ট না করে এদের সংগঠিত করলে আখেরে কাজে দেবে। সামান্য মদত পেলে এরাই স্বাধীন রাজা হয়ে বসবে। সমগ্র উত্তরাপথে মহিষের প্রতি আনুগত্যকে চুরমার করে দেওয়া যাবে এভাবে।'

'আমি সহমত', বললো বিরুপাক্ষ, 'সামাজিক প্রতিষ্ঠার অহংকারে এদের অন্তজ বলে দূরে সরিয়ে রাখলে ভুল করা হবে। ক্ষাত্রগুণে এরা সিংহাসনে বসে থাকা বহু রাজার থেকে যোগ্যতর।'

'আরও একটা ব্যাপার', বললো মাতঙ্গী, 'মহিষাসুর এদেশের সামগ্রিক সমস্যার একটা অংশমাত্র। আমার শিশুকাল কেটেছে গ্রামের অবস্থাপন্নদের বাড়িতে এঁটো বাসন মেজে। আমাদের মতো মেয়েরা যে কী কষ্ট করে লেখাপড়া শেখে, কত গরিব ঘরের প্রতিভাময়ী কন্যাসন্তান সংসারের চাপে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, তা কি এইসব শাসকরা জানে? নিপীড়িত দেশবাসীর জীবনে যদি পরিবর্তন না আনতে পারলাম, তবে এত উদ্যোগ সব মিথ্যে। এইসব শাসকরা, যারা পুরুষানুক্রমে আমাদের মতো গরিবদের হেয় করে এসেছে, তাদের কাছ থেকে পরিবর্তনের আশা করা বৃথা। সেদিক থেকে এইসব বিদ্রোহীরা সঠিক দিশানির্দেশ পেলে সমাজে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে।'

'ব্রঙ্গায় মহিষের শাসনকালে আমিও কিছুকাল বিদ্রোহীর জীবন কাটিয়েছি', বললো দিব্যবল, 'মা দুর্গার সহায়তা না পেলে সারাটা জীবন আমিও ডাকাত হয়েই কাটিয়ে দিতাম। তাই এইসব ডাকাতদের মানসিকতা আমি বুঝি। এদের অনেকের সঙ্গে সেইসময় আমার যোগাযোগও ছিল। আমি

With best compliments from: -

PIONEER PAPER CO.

(Quality Ex-Book Manufacturer with latest technology & Exporter)

REGD OFFICE & WORKS:

74, BELIAGHATA MAIN ROAD
KOLKATA-700 010
PHONE: 2370-4152, FAX: 91-33-2373-2596

Email: pioneerpaperco@gmail.com

Visit Our Website: - www.pioneerpaper.co

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শাড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,
ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৪০২, ২২৬৮-২৮৩৩
২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৫০৮

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,কোলকাতা -
৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ২৪৬৫-৮২৪৬

কাঁচড়াপাড়া ঃ ৬৯/ডি, বাগ স্টেশন রোড, বাগ মোড়, কাঁচড়াপাড়া-৭৪৩ ১৪৫
ফোন ঃ ৭০৪৪০৬২০০০, ২৫৮৫ ৩৩৩৩

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই

আবার তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। ওরা আমাকে জানে। আমাকে বিশ্বাস করবে।'

'খুবই উত্তম প্রস্তাব', বললো হরি, 'আরেকটা কাজ করা যাক। এইসব রাজ্যের স্থানীয় যুবকদের আমি অনুরোধ করবো, স্বীয় রাজাদের সেনাবাহিনীতে বহুল সংখ্যায় যোগ দিতে। রাজসেনার মধ্যে মিশে থেকে এরা সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের ভিত্তি তৈরি করতে থাকবে। তারপর ঠিক সময়ে যুগপৎ সেনাবিদ্রোহ ও বিদ্রোহীদের আক্রমণ আমাদের কাজ সরল করে দেবে।'

'ভালো পরিকল্পনা', বললো দুর্গা, 'দেখা যাক, এইভাবে উত্তরাপথে মহিষের সমর্থনের ভিত্তি নাড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা। একটা বড় সমস্যার সমাধান হবে তাতে। রাজকর থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে না আর দানবরা।'

'দাক্ষিণাত্যের রাজাদের সমস্যাটা আবার অন্যরকম', বললো ইন্দ্র, 'উত্তরাপথ জুড়ে মহিষ যখন ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল, তখন এরা সাবধান হয়নি। আজও এরা সমস্যাটাকে স্বীকার করতে চাইছে না। মহিষ এদের ঘাড়ের ওপর চড়ে বসে ক্রমাগত শক্তিসঞ্চয় করে চলেছে, আর এরা ভাবছে, অসুররা শিগগিরই চলে যাবে। জোট বেঁধে মহিষকে মহীশূর থেকে তাড়ানোর কোনো চেষ্টাই নেই এদের মধ্যে। তাই সেখানেও বর্তমান রাজশক্তিকে অপসারিত করে নবীন রাজশক্তিকে শাসনক্ষমতায় আনা দরকার।'

'এর থেকেও বড় সমস্যা হলো রক্তবীজ', বললো রুদ্র, 'যখনই মহিষ বিপদে পড়ে, কোন এক জাদুমন্ত্র বলে এরা এসে হাজির হয়, মহিষকে বাঁচিয়ে নিয়ে যায় চরমতম বিপদ থেকেও। আরও মুশকিল হলো, যতই আমরা এদের হত্যা করি, ততই আরও বেশি সংখ্যায় এরা ফিরে ফিরে আসে। যতদিন না রক্তবীজদের শাসন করা হচ্ছে, ততদিন মহিষকে পরাজিত করা অসম্ভব।'

'আমি সহমত', বললো দুর্গা, 'রক্তবীজের অস্তিত্ব আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু কী করা যায় এব্যাপারে?'

'মারলে ওরা বেঁচে ওঠে', অনেকটা স্বগতোক্তির ঢঙে বললো কালী, 'বাঁচিয়ে তুললে কি ওরা মরে যাবে?'

'কী বললে?' চমকে উঠলো দুর্গা।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে', বললো কালী, 'রক্তবীজদের বংশ কী করে ধ্বংস করা যায়, তাই নিয়ে।'

'কী করে করা যায় সেটা?' বললো হরি।

'বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই এখন', বললো কালী, 'তবে এটুকু বলছি, রক্তবীজদের ফিরে ফিরে আসার রহস্যতেই নিহিত আছে ওদের মরণবাণ। যদি আমার পরিকল্পনা সফল হয়, রক্তবীজদের নিয়ে আর কারোর কোনো চিন্তা থাকবে না।'

'সংসাধন কী কী লাগবে?' প্রশ্ন করলো দুর্গা।

'চামুণ্ডাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ একশো যোদ্ধাকে নিয়ে একটি দল তৈরি করতে হবে', বললো কালী। 'এরা সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে। কতকাল তার কোনো ঠিক নেই। কাজ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত এরা ঘরে ফিরবে না। এমনকী এরা আদৌ ঘরে ফিরতে পারবে কিনা, সেটাও নিশ্চিত নয়। এই যোদ্ধাদের সেইভাবেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বেরোতে হবে।'

'উত্তম', বললো দুর্গা, 'তুমি আজ থেকেই কাজে লেগে পড়ো। নিজে বেছে নাও কোন কোন যোদ্ধা তোমার এই দলে যোগ দেবে। আর কী চাই বলো।'

'আর প্রয়োজন একটি বিশেষ শক্তিপীঠের সহায়তা', বললো কালী।

'কোন শক্তিপীঠ?', দুর্গার চোখে আশঙ্কার ছায়া। শক্তিপীঠদের কাছ থেকে সহায়তা আদায় করা অত্যন্ত কঠিন। হয়তো বা অসম্ভবও। বিশেষ করে যুদ্ধপ্রচেষ্টায়।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে পেঁজা তুলোর মতো কুয়াশা আটকে রয়েছে। ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে হাতির পায়ে-চলা পথ। পূর্ণচন্দ্রের ঝিকিমিকি আলো ঘন পাতার চাঁদোয়ার ফাঁক গলে টাপুর-টুপুর ঝরে পড়ছে, কুয়াশার সঙ্গে মিশে অপার্থিব এক মায়াজগতের রচনা করছে বনপথের বাঁকে বাঁকে। একটু এগিয়ে সেরকমই এক বাঁকের মুখে দেখা মিলল নিশানদিহি খাম্বার। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ঝলমল করছে, পালিশ করা শরীর থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। লম্বায় প্রায় এগারো হাত, খাড়াই কাঠের স্তম্ভ। একটাই গাছের গুঁড়ি থেকে তৈরি, কোথাও কোনো জোড় নেই। গায়ে সর্বত্র করোটির চিহ্ন খোদাই করা। কুকুর, শেয়াল, মোষ, সাপ, মানুষের করোটি। সেই খাম্বার কাছে এসেই জঙ্গলটা হঠাৎ ফুরিয়ে গেল।

গহন বনের আস্তরণ ভেদে করে বেরিয়ে এসেছে দিগন্তব্যাপী ছাই-ঢাকা এক উলঙ্গ প্রান্তর, পোড়া ঘাসে ঢাকা। চাঁদের রুপোলি আলোয় মৃত্যুর মতো সাদা। অনেক বড় বড় পাথর ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। দেখে মনে হয় জীবন্ত, স্থির

अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो
जान लेवा हो सकता है ।

SHREE ULTRA RED-OXIDE
जंग रोधक सीमेंट

SHREE CEMENT LIMITED

Registered Office :
Bangur Nagar, Beawar, Dist. Ajmer
(Rajasthan) 305 901
Phs. : +91 01462 228101-106
Fax : 01462 228117/119
e-mail : sclbwr@shreecementltd.com

Corporate Office :
21 Strand Road, Kolkata 700 001
Phs. : +91 33 2230 9601-04
Fax : +91 33 2243 4226
e-mail : sclcal@shreecementltd.com

Marketing Office :
1 Bahadur Shah Zafar Marg
122/123, Hans Bhawan, New Delhi 110 002
Ph. : 09313565826
Fax : +91 11 22370499
e-mail : scldel@shreecementltd.com

website: www.shreecementltd.com

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—

Usha Kamal

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947

Deals in : Marble, Granites Tiles,
Ceramic Tiles, Stone etc.
Authorised Dealer of

KAJARIA CERAMICKS LTD.
'NAVEEN' brand tiles
REGENCY CERAMICES LTD.
BELLS CERAMICES LTD.
ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53
Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
Godown : 2403-4014

With Best Compliments From :

Wadhwana

"Park Center"
24, Park Street,
Kolkata - 700016
Phone :2229-8411/1031/4352
Fax : 91 33 2229-0492
e-mail : wadhwana@vsnl.com

অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে না-জানি কিসের প্রতীক্ষায়। সেই তেপান্তরের মাঠের ঠিক মাঝখানে বিশাল এক বটগাছ, বয়সের গাছপাথর নেই তার। ঝুরি নেমেছে সর্বত্র। গাছের নীচে ধুনি জ্বলছে। ধুনির সামনে পঞ্চমুণ্ডির আসন, পাঁচরকম পশুর করোটি দিয়ে তৈরি। তার ওপর শায়িত একটি মৃত মানবদেহ। অনাবরণ সেই মৃতদেহের বুকের ওপর পদ্মাসনে বসে আছে বলিষ্ঠ এক কাপালিক। পরনে রক্তবস্ত্র, গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা মুখ। দু-চোখ বোজা, মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে অদ্ভুত সব শব্দ অনর্গল উচ্চারণ করে চলেছে। কাপালিকের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো কালী। পায়ের শব্দে চোখ খুলল কাপালিক। কালীর দিকে খানিকক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর হেসে উঠলো হা-হা করে।

‘এই কচি বয়সেই এতসব কাণ্ড করে ফেলেছিস?’ বললো কাপালিক, ‘বাঃ, বাঃ বেশ। কিন্তু ভোগ শুরুর আগেই ত্যাগ? এ কি অন্যায়। আয় তোকে আমি ষড়ৈশ্বর্য ভোগের উপায় বলে দেব। আয়, আয়।’

কালী কোমরবন্ধ থেকে ওর খড়্গটাকে খুলে হাতে তুলে নিল, শক্ত করে আঁকড়ে উঁচিয়ে ধরলো।

‘এতবড় আস্পর্ধা তোর?’ রাগে ফেটে পড়লো কাপালিক। ‘আমাকে অস্ত্র দেখাস?’

মুহূর্তে কালীর সামনে আবির্ভূত হলো ভয়ংকর এক পিশাচ। লম্বায় সাত হাত, কঙ্কালসার। ভাঁটার মতো চোখদুটো, বড় বড় নোংরা নখ হাতে। পুতিদুর্গন্ধময়, সারা শরীর থেকে পুঁজ গড়াচ্ছে। হাতদুটো বাড়িয়ে পিশাচ তেড়ে এলো ওর দিকে। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে কালী খড়্গ দিয়ে আক্রমণ করল পিশাচকে। খড়্গের এক আঘাতে দু-টুকরো হলো পিশাচ। অবাক কাণ্ড! যেমন করে একটা জলের বুদবুদ ভেঙে দুটো বুদবুদ হয়, এক পিশাচ ভেঙে দুটো পিশাচ হলো। দুজন মিলে আক্রমণ করলো কালীকে। আবার খড়্গের প্রহার। টুকরো হলো পিশাচদুটো, প্রতিটা টুকরো থেকে আরেকটা নতুন পিশাচের আবির্ভাব হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই পিশাচদের ভিড় জমে গেল কালীর সামনে। হতাশ কালী থমকে দাঁড়ালো কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই দুপা পিছু হটে নির্ভুল লক্ষ্যে হাতের খড়্গ ছুঁড়ে মারলো কাপালিকের দিকে। খড়্গের স্পর্শমাত্রই কুয়াশার মতো অন্তর্হিত হলো কাপালিক, পঞ্চমুণ্ডির আসন। অন্তর্হিত হলো পিশাচের দল। কালী দেখল, বটগাছের নিচে

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

With Best Compliments from :

C. S. SALES (INDIA) PVT. LTD.

18, Amratala Street, 1st Floor

Kolkata - 700 001

ধুনি জ্বলছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও একা। কেউ কোথাও নেই। দূরে কোথাও কায়াহীন কেউ বুকফাটা স্বরে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলো— হা-আ-আ-আ...

ধুনি থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিলো কালী, বটগাছের গুঁড়ির শুকনোর একটা ফোকরে গুঁজে দিল সেটা। পটপট শব্দ জ্বলে উঠলো শুকনো কাণ্ড, ডালপালা। তীব্র এক আর্তনাদ ভেসে এলো ওপর থেকে। কালী দেখলো, অনেক উঁচুতে ঘন পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে হেঁটমুণ্ডু একটা শরীর। সেই কাপালিক, গাছের ডালে পা আটকে উল্টে ঝুলছে।

‘অ্যাই পাগলি?’ চিৎকার করে উঠলো কাপালিক, ‘করছিস কী?’

‘অনেক রসিকতা হয়েছে, আর নয়।’ জ্বলন্ত চ্যালাকাঠটাকে গাছের ফোকর থেকে টেনে বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো কালী, ‘নীচে নেমে আসুন, কথা আছে।’

অসংখ্য পাখির কিচিরমিচিরের সঙ্গে জঙ্গলে ভোর হলো। বনের প্রান্তে তেপান্তরের মাঠে বটগাছতলায় আজ জনাত্রিশেক লোক জড়ো হয়েছে। তারমধ্যে একজন গতরাতের সেই কালালিক, তার নাম তারক। সেই প্রথম কথা বললো,

‘মা, ব্যাপারটা বুঝে দ্যাখ। বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ এই শক্তিপীঠে। তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তাই এইভাবে জোর করে দেখা করার চেষ্টা করে ভালো করিসনি।’

‘জোর না করলে কি দেখা করতেন আপনারা?’

‘ও কথা থাক, ‘সমবেত লোকেদের মধ্যে থেকে একজন বললো, ‘এখন বলুন, আমাদের সঙ্গে দেখা করার কী এত জরুরি দরকার পড়লো?’

‘বলছি’, বললো কালী, ‘তার আগে বলুন, বিগত দশ বছর ধরে মহিষাসুরের সঙ্গে আমাদের যে যুদ্ধ চলছে, সে বিষয়ে আপনারা কী জানেন?’

‘এটুকু নিশ্চয়ই জানি’, বললো আরেকজন, ‘দুর্গা নামের ওই মেয়েটি পরপর দুবার মহিষাসুরকে পরাজিত করেছিল। প্রথমবার ব্রঙ্গায়, দ্বিতীয়বার মধ্যভারতের মালভূমিতে। দুবারই মহিষ রক্ষা পায় রক্তবীজের সাহায্যে। রক্তবীজ নিজের প্রাণ দিয়ে মহিষের প্রাণ রক্ষা করেছিল। মহিষ তাই আজও অজেয়।’

‘ঠিক ধরেছেন। তা, বলুন তো, তৃতীয়বারের আক্রমণেও কি দুর্গা সফল হবে?’ প্রশ্ন করলো কালী।

‘হবে না’, বললো কাপালিক তারক, ‘এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যতদিন রক্তবীজ-প্রথা জীবিত আছে, ততদিন কারোর পক্ষেই মহিষাসুর-দমন সম্ভব হবে না।’

‘আর ঠিক সেজন্যই আপনাদের কাছে আসা’, বললো কালী।

‘আমাদের কাছে কেন?’

‘রক্তবীজকে পরাজিত করতে হলে আপনাদের সহায়তা প্রয়োজন। আপনারা ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারবে না।’

‘সেটা কীভাবে?’

‘বলছি’, বললো কালী, ‘তার আগে বলুন, রক্তবীজের জীবনীশক্তির রহস্য কী? অগণিত রক্তবীজকে হত্যা করেছি আমরা বারংবার। প্রতিবারই ওরা আরও বেশি সংখ্যায় ফিরে আসে। আপনাদের কি মনে হয়, কেন রক্তবীজের প্রতিটি রক্তবিন্দু ভূমিস্পর্শ করা মাত্র আরেকটি রক্তবীজ জন্ম নেয়?’

‘এবিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা নেই’, বললো কাপালিক, ‘কেনই বা থাকবে? আমরা লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে থেকে প্রকৃতির রহস্যের অনুসন্ধান করে বেড়াই। শহুরে রাজনীতি নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।’

Best Compliments

from-

A
Well
Wisher

'তাহলে আমি বলি', বললো কালী, 'অসুরদের শক্তির উৎস ওদের পরলোকে অন্ধ বিশ্বাস। অসুরদের বিশ্বাস, অসুধর্মে অবিশ্বাসী অর্থাৎ প্রকৃতিপূজকদের হত্যা করতে গিয়ে যদি ওরা প্রাণ দেয়, তবে মৃত্যুর পরে ওদের স্থান হবে এমন এক কল্পিত স্বর্গলোকে, যেখানে অনন্তকাল ধরে ওরা ইচ্ছামতো সুখভোগ করতে পারবে। অসু ধর্মগুরুরা পিশাচ স্বভাবের লোকেদের উপযোগী করে সে স্বর্গের বর্ণনা করে। এমন সব সুখের খুড়োর কল ঝুলিয়ে দেয়, যা শুধু পিশাচদেরই প্রলুব্ধ করে। যে অসুররা এসব কথা অন্ধের মতো বিশ্বাস করে ফেলে, তারাই হয়ে ওঠে রক্তবীজ।'

'ঠিক বুঝলাম না', বললো কাপালিক, 'বিরোধীদের হত্যা করলেই অক্ষয় স্বর্গলাভ? এসব কথা ধর্মগুরুরা প্রচার করছে?'

'ঠিক তাই', বললো কালী, 'এরা বলছে, প্রকৃতিপূজকদের হত্যা করলেই নিশ্চিত স্বর্গবাস হবে। এরা বিশ্বাস করে, অসুধর্মে অবিশ্বাসী কারোর সঙ্গে যুদ্ধে যদি এদের কারোর প্রাণ যায়, তবে সেই অসুরের প্রথম রক্তবিন্দু মাটিতে পড়ার মুহূর্তেই সে সেই সর্বসুখের উৎস পরলোকের দর্শন পাবে। স্বয়ং অসু তাকে অভ্যর্থনা করবে, দিব্যাঙ্গনা বারাঙ্গনাদের দিয়ে হাতেনাতে পুরস্কৃত করবে। পিশাচস্বভাব অর্ধশিক্ষিত অসুর পুরুষরা এইসব মনগড়া প্রতিশ্রুতি সত্যি বলে বিশ্বাস করছে। দলে দলে জড়ো হচ্ছে অনর্থক প্রাণ দিতে, মিথ্যে এক পরলোকের প্রতিশ্রুতিতে ভুলে। আর আমরা অসহায়ের মতো এসব দেখে যাচ্ছি। এতবড় মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, অথচ সেটাকে মিথ্যে প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই আমাদের কাছে। কারণ...'

'কারণ', বললো তারক, 'মৃত্যুর পরে কী হয়, সেটা কেউ জানে না। মরণের ওপার থেকে কেউ তো আর ফিরে আসে না, নিজের অভিজ্ঞতা বলার জন্য কে বলবে, ওপারে স্বর্গ আছে, না নরক আছে, নাকি অন্য কিছু আছে।'

'শুধু আপনারা ছাড়া', 'বললো কালী, 'আর সেখানেই আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন।'

'তার মানে?' ক্রুদ্ধ কঠিন স্বরে বললো তারক, 'পরিষ্কার করে বল মেয়ে, আমাদের কাছ থেকে কী সাহায্য আশা করিস?'

'এ-এ অসম্ভব', জোরে মাথা নেড়ে বললো তারক, 'না, না। এ আমরা করতে পারি না।'

'কেন করতে পারেন না?' বললো কালী, 'এ বিদ্যা কি আপনাদের আয়ত্তের বাইরে?'

'বলিস কি, আয়ত্তের বাইরে?' ক্রুদ্ধস্বরে হুংকার দিয়ে উঠলো তারক, 'এই ভূভারতে একমাত্র এই শক্তিপীঠেই এই বিশেষ বিদ্যাটির চর্চা ও গবেষণা হয়। এ বিষয়ে আমরা যতটা জানি, পৃথিবীর আর কেউ ততটা জানে না।'

'তাহলে অসম্ভব বলছেন কেন', বললো কালী।

'অসম্ভব বলছি, কারণ গুরুপরম্পরায় আমাদের ওপর নিষেধ রয়েছে, শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চা ভিন্ন এই বিদ্যার প্রয়োগ করতে পারি না আমরা। তাছাড়া, এই বিদ্যা ছেলেখেলার জন্য নয়। প্রয়োগের সামান্য ভুল সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।'

'ছেলেখেলা করতে আমি এতদূর আসিনি', বললো কালী, 'অন্য কোনো উপায় থাকতে এ অনুরোধ করতাম না। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।'

'দ্যাখ মেয়ে', বললো তারক, 'আগেই বলেছি, আমরা নিরালায় বিজ্ঞানচর্চা নিয়ে ব্যক্ত থাকি। মহিষ জিতলো, কী তোরা জিতলি, তাতে আমাদের কী আসে যায়? কেনই বা আমরা তোদের জেতাতে আমাদের গুরুর নিষেধ লঙ্ঘন করবো?'

'হুঁঃ', দুঃখের হাসি হাসলো কালী, 'জানেন তো, আপনাদের কাছে যেটা নিরালায় বিজ্ঞানচর্চা, অসুরদের কাছে সেটা ব্যভিচার। মাত্র ছ-মাসের শাসনে ব্রঙ্গার অধিকাংশ শক্তিপীঠ ধ্বংস করেছিল মহিষ। নির্বিচারে হত্যা করেছিল সেখানকার তপস্বী সাধকদের। সেখানকার যাবতীয় অর্জিত জ্ঞান আজ লুপ্ত। আর আজ সেই মহিষ আপনাদের দোরগোড়ায় উপস্থিত। এখান থেকে মাত্র একদিনের দূরত্বে ঘাঁটি গেড়েছে সে। পাহাড়ের ওপর নগর পত্তন করেছে। তার নজরে আপনারাও আছেন। যে কোনোদিন সে আক্রমণ করতে পারে এই পীঠস্থান। কী করবেন তখন? ওইসব সমবারি মায়া দেখিয়ে তাকে ভোলাতে পারবেন না। শুনেছি মায়ায় সেও সিদ্ধহস্ত। এই বটবৃক্ষের অস্তিত্ব সে নাও জানতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। বটগাছ শুদ্ধ গোটা জঙ্গলটাকেই অগ্নি-সমর্পণ করবে মহিষ।'

'আমাদের একটু ভাববার সময় দে মা', কাপালিকের গলায় দ্বিধার সুর।

'ভাবুন, ভাবুন', বললো কালী, 'শুধু এটুকু বলে রাখছি, বেশি সময় নেই হাতে। দীর্ঘকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিণামে মহিষ আজ উত্তরাপথ থেকে বিতাড়িত হয়ে এই দুর্গম পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে বসে সে শক্তিসঞ্চয় করছে, রক্তবীজের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। খুব শিগগিরই সে নববলে

বলীয়ান হয়ে পুনরায় আমাদের আক্রমণ করবে। বহু বছর ধরে যুদ্ধ করে আমরা ক্লান্ত, বহুলাংশে হীনবল। যেদিন মহিষ আবার আক্রমণ করবে, সেদিন আমরা তাকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হতে পারি। তারপর কী হবে? তখন যেন হাত কামড়াবেন না, সময় ছিল, সুযোগ ছিল, শুধু সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি বলে এত প্রাচীন এক শক্তিপীঠ ধ্বংস হয়ে গেল!'

সূর্যদেব এইমাত্র অস্ত গেলেন সিন্ধুসাগরে। তাঁর সিঁদুরলেপা যাত্রাপথে এখনো একটু রঙের আভাস রয়ে গেছে। সিন্ধুসাগর ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে এই ধীবরপল্লী। সমুদ্রের ধার ধরে ছড়ানো গ্রামটা। গ্রামের ঠিক মাঝখানে মা আপার থান (আপা মনে অপঃ, জল, অর্থাৎ বরুণী)। আজ নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে কাঠকুটো জড়ো করা হয়েছে দেবতার থানের সামনে। ধীবরপল্লীর সবাই কাজ সেরে একে একে এসে জড়ো হচ্ছে সেখানে। আজ পূর্ণিমা, সহভোজের দিন। আগুনের ধারে অনেক রাত পর্যন্ত নাচগান হবে। তালগাছের রস সংগ্রহ করে আসব তৈরি হয়েছে গত একমাস ধরে, এই দিনটার জন্য। ভর্জিত মৎস্যাণ্ড সহযোগে সেই আসব পান করবে সবাই। এই সামান্য আনন্দটুকুর আশায়ই তো এ গ্রামের জেলেরা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে প্রতিদিন।

দুটো চকমকি পাথর পরস্পর ঠুকে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছিল গ্রামপ্রধান চুচুক। সবেমাত্র আগুন ধরেছে, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এসে হাজির হলো গ্রামের এক যুবক।

'হুলা যে, কী ব্যাপার?' বললো চুচুক, 'এত হন্তদন্ত হয়ে কোত্থেকে আসছিস?'

'খারাপ খবর আছে মোড়ল', বললো সেই যুবক, 'অসুররা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করতে আসছে।'

'তুই জানলি কী করে?' চুচুক অবাক।

'আমি উত্তরের জঙ্গলে গেছিলাম, চন্দনকাঠের সন্ধানে। কাঠ কেটে ফিরছিলাম। দেখি এক জায়গায় পথের ধারে অনেক অসুর-সৈন্য বিশ্রাম করছে। আড়ি পেতে শুনলাম ওদের কথাবার্তা। ওরা এই তল্লাটের সব জেলেদের জবরদস্তি অসুধর্মে দীক্ষা দেবে ঠিক করেছে। আমাদের গ্রাম ওদের ঘাঁটি থেকে সবচেয়ে কাছে। ওদের সেই নতুন শহর থেকে রাস্তাটা তো উত্তরের জঙ্গল হয়ে সোজা এই গ্রামেই এসেছে। তাই প্রথম কোপ আমাদেরই ওপর পড়বে।'

স্তম্ভিত চুচুকের হাত থেকে চকমকি পাথরদুটো পড়ে গেল।

'এখন কী হবে মোড়ল?' বললো হুলা।

'ওরা সংখ্যায় কত?' চুচুক জিজ্ঞেস করল।

'আন্দাজ পাঁচশো। বেশিও হতে পারে।'

মনের মধ্যে দ্রুত পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে নিল চুচুক। গ্রামে জনাচল্লিশেক জেলের বাস। তার মধ্যে বুড়োবুড়ি আছে, বাচ্চাকাচ্চা আছে। এরা কী করে পাঁচশো সেনার মোকাবিলা করবে?

'লড়াই করে অসুরদের সঙ্গে জেতা যাবে না', বললো চুচুক, 'তাই মাত্র দুটো রাস্তা খোলা আছে আমাদের জন্য। এক, আত্মসমর্পণ। তার মানে, আমাদের পরম্পরা সব ভুলে গিয়ে ওদের নিয়ম মেনে চলা, ওদের ঠাকুরকে পুজো করা।'

অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠলো গ্রামের মেয়েরা, 'মা আপা ছাড়া আর কারোর পুজো করবো না আমরা। যুগ যুগ ধরে মা আপা সমুদ্রের ঝড়ে আমাদের রক্ষা করেছেন। মাছ জুগিয়েছেন, তাল আর নারকেল জুগিয়েছেন। আজ বিপদের মুখে তাঁকে ভুলে যাবো? কখনো নয়। তার বদলে মরে যাওয়াও ভালো।'

'তাহলে আরেকটাই পথ রয়েছে', বললো চুচুক, 'পালাতে হবে।'

'কোথায় পালাবো?', বললো একজন বৃদ্ধ।

'হাতে কতটা সময় আছে?' চুচুক প্রশ্ন করল হুলাকে।

'এক প্রহরের বেশি নয়। চন্দনের জঙ্গলের যেখানটায় ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে, সেই জায়গাটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।'

'তার মানে সবাইকে একসঙ্গে পালাতে হবে। জঙ্গলে পালিয়ে লাভ নেই, ওরা ধরে ফেলবে। পালাতে হবে সমুদ্রে। অথচ সবাইকে নেওয়ার মতো যথেষ্ট সংখ্যায় নৌকো নেই আমাদের কাছে।'

আঙ্গুল উঁচিয়ে হুলা পশ্চিমে অনতিদূরে জলের ওপর মাথা উঁচিয়ে থাকা ডুবোপাহাড়টার দিকে ইঙ্গিত করল, 'যদি আমরা ওই জলটুঙ্গিটাতে গিয়ে লুকিয়ে থাকি? এখান থেকে ওখানে যেতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। তিনবার এপার-ওপার করলেই সবাইকে পৌঁছে দেওয়া যাবে।'

'যদি ওরা জানতে পারে, আমরা ওখানে লুকিয়ে আছি?'

'জানতে পারলেও নৌকো জোগাড় করে ওখানে পৌঁছানো সহজ হবে না। ততক্ষণে অন্য কোনো একটা উপায় ভাবা যাবে।'

'ঠিক আছে, তবে তাই হোক।' বললো চুচুক।

দেখতে দেখতে সবাই নৌকো নিয়ে ভেসে পড়ল সমুদ্রে। সঙ্গে দেবীর সিঁদুরলেপা মূর্তি ও সামান্য কিছু খাবারদাবার। পেছনে পড়ে রইল গ্রাম, খালি দেবস্থান। পড়ে রইল পূর্ণিমার উৎসব, খেটেখাওয়া জেলেদের একটা রাত আনন্দ করার সাধ। সাগরপাড়ের দেবস্থানের সামনে জ্বালানো উৎসবাগ্নি তবু জ্বলতেই থাকলো।

জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে গোল রুপোলি থালার মতো মস্তবড় একটা চাঁদ দেখা দিল আকাশে। গা থেকে তার টপটপ করে রুপো ঝরে পড়ছে। চাঁদের গুঁড়ো ভাসছে সাগরের শ্যাওলা সবুজ ঢেউতে। মায়াবী সেই রাতে মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো অসুরের দল এসে পড়লো সমুদ্রতীরে।

এত নিরালা কেন? গ্রামের লোকেরা হৈচৈ চিৎকার কান্নাকাটি করছে না কেন? সবাই কি ঘরে খিল তুলে দিয়ে লুকিয়ে বসে আছে? রক্তবীজের নির্দেশে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিল অসুরবাহিনী। প্রতিটা কুটিরে ঢুকে বাসিন্দাদের টেনে বার করতে অনেক সময় লাগবে, তার চেয়ে এই ভালো। আগুনের জ্বালায় নিজেরাই বাপ-মা বলে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

অর্ধদণ্ড পার হয়ে গেল। অবাক হয়ে রক্তবীজ দেখলো, জ্বলন্ত গ্রাম থেকে কেউ বেরিয়ে এলো না। তবে কি সবাই আগেভাগেই পালিয়ে গেছে? রাগে হতাশায় চিৎকার করে উঠলো রক্তবীজ।

‘এত তাড়াতাড়ি কী করে উধাও হয়ে গেল এতগুলো লোক? এ কি জাদু নাকি?’

‘নিশ্চয়ই ওরা জঙ্গলে পালিয়েছে।’ বললো এক পার্শ্বচর, ‘আমরা এসেছি উত্তরদিক থেকে, তার মানে ওরা দক্ষিণদিকের জঙ্গলে ঢুকেছে।’

‘ঠিক বলেছো, তাই হবে’, বললো রক্তবীজ, ‘অ্যাই, চলো সবাই। লোকগুলোকে ছেড়ে দিলে চলবে না। প্রত্যেকটাকে ধরতে হবে। মেয়ে-বুড়ো বাচ্চা কাউকে বাদ দিলে চলবে না। এটা মহিষাসুরের সম্মানের প্রশ্ন।’

জ্বলন্ত গ্রাম ছেড়ে অসুরসেনা দৌড়লো দক্ষিণের জঙ্গলের দিকে। এদিককার পথঘাট জলজঙ্গল অনেকটাই উত্তরাপথ থেকে আসা অসুরদের অচেনা। উত্তরের চন্দনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রশস্ত পথ আছে, কিন্তু দক্ষিণের জঙ্গলের মধ্যে কোনো পথ নেই, সেটা ওদের জানা ছিল না। নিজেদের অজান্তেই অসুররা পা বাড়ালো মরণের ফাঁদে। দক্ষিণের ঘন জঙ্গল, অজস্র নাম না-জানা গাছ সেখানে এঁকেবেঁকে আকাশের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সে গাছেদের ব্যূহ ভেদ করে দেখা যায় না ওদিকে কী আছে। পথ চলা যায় না, পা জড়িয়ে যায় বুনো লতায়। একেক জায়গায় দুটো গাছের মঝে একটা মানুষ গলে যাবার মতো যথেষ্ট পরিসর নেই। সেখানে ঘন অন্ধকারের মধ্যে যেন ভোজের বাজি শুরু হলো। নিঃশব্দে এক এক করে অসুররা অদৃশ্য হতে লাগলো। প্রায় একদণ্ড পথ চলার পর রক্তবীজ খেয়াল করলো, এখনো একটাও গ্রামবাসীর দেখা পাওয়া যায়নি। আর তখুনি মশালের আলোয় দেখতে পেল, সামনে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে।

কে ওটা? কোনো জেলে ব্যাটা নিশ্চয়ই। পালাতে গিয়ে পিছলে পড়ে কী সাপের কামড়ে মরেছে!

কাছে গিয়ে মশালটা উঁচিয়ে ধরল রক্তবীজ। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। জেলে তো নয়, মৃতদেহটা ওরই সঙ্গী একজন অসুরসেনানীর। একটু আগেও তো লোকটা জ্যান্ত ছিল। আর এখন? কে যেন অসীম শক্তিতে লোকটার ঘাড় মুচড়ে ভেঙে দেহটা অবহেলায় ফেলে রেখে গেছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো রক্তবীজ। যাত্রা শুরু হয়েছিল পাঁচশো অসুর নিয়ে। এখন ওর সঙ্গে মাত্র জনা পঁচিশেক রয়েছে। বাকিরা কোথায় গেল? জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে? নাকি ভূতপ্রেত ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলেছে ওদের?

‘এই, শোনো সবাই’ হেঁকে বললো রক্তবীজ, ‘আর জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে লাভ নেই। ওই গ্রামটাতে ফিরে চলো। আর শোনো, সবাই পথ খুব সাবধানে চলবে। কিছু একটা গোলমাল রয়েছে এখানে।’

রক্তবীজের সাবধানবাণীতে খুব একটা লাভ হলো না। অন্ধকারের ভোজবাজি চলতেই থাকলো। আরও এক প্রহর পরে রক্তবীজ যখন বহ্নিমান গ্রামে ঢুকলো, তখন ওর সঙ্গে মাত্র দু’জন। বাকি সবাই উধাও হয়েছে।

গ্রামে ঢুকতেই বন্দি হলো রক্তবীজ ও তার দুই সঙ্গী। যারা ওদের বন্দি করলো, তারা রক্তবীজের অচেনা নয়। কোনো

AVIMA EXPORTS (P) LTD.

Exporters of Quality Jute Goods & Rice

91A/1, Park Street, Office No - 2
Kolkata-700 016
Phone : 40050050 / 51
Fax : 2243 2659, 40050071
e-mail : info@juteonline.com

With Best Compliments From-

S. K. KAMANI

অসুরসেনারই অপরিচিত নয় এরা। এরা হলো চামুণ্ডাবাহিনী। সম্পূর্ণরূপে নারীযোদ্ধাদের নিয়ে সংগঠিত এক সুশৃঙ্খল ভয়ংকর রণচণ্ডী বাহিনী। গত দশ বছরে এদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছে অসুরসেনা।

চামুণ্ডাবাহিনীর সেনানীরা রক্তবীজ ও তার সঙ্গীদের হাজির করলো তাদের দলনেত্রীর সামনে। রক্তবীজ ভালো করে তাকিয়ে দেখল সেই নেত্রীর দিকে। সদ্যযুবতী, দীর্ঘদেহিনী। অমামান্য সুন্দর মুখমণ্ডল। একঢাল কালো কোঁকড়া চুল পিঠ গড়িয়ে নেমেছে। যেন কালো পাথর কুদে বানানো শরীর, চিতাবাঘের মতো ঋজু ও সবল। পরনের কালো পোশাক শরীরের সঙ্গে মিশে গেছে। গলায় সদ্যোমৃত অসুরদের মুণ্ডমালা। ঠোঁটের কশ গড়িয়ে রক্তের ধারা নামছে। হাতে রক্তমাখা খড়্গ।

'কে তুমি?' প্রশ্ন করলো রক্তবীজ।

'কালী।'

কালী! নামটা শুনেই রক্তবীজের হাত-পা কাঁপতে শুরু করলো। দানবদের কাছে অপরিচিত নয় নামটা। তবু জোর করে মনে সাহস এনে বললো,

'আমাদের মেরে তোমার কোনো লাভ হবে না। আমাদের মৃত্যুর খবর শুনে আরও অনেক অসুর প্রাণ দিতে এগিয়ে আসবে। আমরা রক্তবীজ।'

'ঠিক সেজন্যই তোমাকে এখানে টেনে এনেছি', বললো দলনেত্রী।

'তার মানে?' অবাক হলো রক্তবীজ। এরকম একটা কথা ও প্রত্যাশা করেনি।

'শোনো তবে, কেন তোমাকে বন্দি করেছি। আচ্ছা, এই যে তোমাদের একজন মরলে আরেকজন জন্মায়, সেটা তো এই আশা থেকেই, যে আমাদের সঙ্গে লড়াই করে মরলে তোমরা তৎক্ষণাৎ স্বর্গে যাবে। তাই না?'

'হ্যাঁ', বললো রক্তবীজ, 'আজ যদি তুমি আমাকে হত্যা করো, তাহলে আমার শরীরের প্রথম রক্তবিন্দু মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি স্বর্গ দেখতে পাবো। সেখানে পরমপিতা অসু আমার জন্য...'

'হয়েছে হয়েছে', বাধা দিল কালী, 'আর বর্ণনা দরকার নেই। তা, এসব কথা তোমরা সবাই বিশ্বাস করো তো?'

'নিশ্চয়ই', বললো রক্তবীজ, 'এটা হলো প্রতিটি অসুরের কাছে আমাদের পরমপিতা অসু-র অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার আমাদের অসুধর্মের মূল ভিত্তি।'

'বাঃ, খুব ভালো', বললো কালী, 'এসো, আজ তোমাদের বিশ্বাসের এই ভিত্তিটাকে একটু ঘেঁটি ধরে নাড়িয়ে দেওয়া যাক। তোমার এই দুই সঙ্গী তার সাক্ষী থাকবে। এই নাও, তোমার অস্ত্র তুলে নাও।'

এক পা এগিয়ে এসে মাটি থেকে তরবারি কুড়িয়ে হাতে তুলে নিল রক্তবীজ। হুংকার দিয়ে লাফিয়ে পড়লো কালীর ওপর। কালী অবলীলাক্রমে এক পা পাশে সরে গিয়ে সেই আক্রমণ এড়িয়ে গেল। রক্তবীজকে সামলানোর সুযোগ না দিয়ে পদাঘাতে ভূ লুণ্ঠিত করলো তাকে। ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো রক্তবীজ। কালীর সঙ্গে রক্তবীজের এক ভয়ংকর দ্বৈরথ শুরু হলো।

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোলো, সে রক্তে ভিজে গেল মাটি। হাত দিয়ে কণ্ঠা চেপে ধরে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রক্তবীজ। বারকতক কেঁপে উঠলো, তারপর নিথর হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। নিজের কাপড়ে রক্ত মুছে হাতের খড়্গ কোমরবন্ধে বন্দি করলো কালী।

'কী মনে হয়, তোমাদের সর্দার কী এতক্ষণে স্বর্গে পৌঁছেছে?' কালী প্রশ্ন করলো রক্তবীজের সঙ্গীদের।

'নিশ্চয়ই', রাগে টগবগ করে ফুটতে ফুটতে এক সঙ্গী বললো, 'ওর রক্ত মাটিতে পড়েছে, তার মানে ও স্বর্গে পৌঁছে গেছে। এবার দেখবে, ওর স্বার্গারোহণে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও কত রক্তবীজ জন্মায়।'

'আর সেটাই তোমাদের মূল বিশ্বাস, তাই তো?'

'নিশ্চয়ই'।

'এক কাজ করো। ওর হৃদস্পন্দন, ওর নাড়ি পরীক্ষা করে দেখো, ও সত্যিই মরেছে কিনা। কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখার দরকার কী?'

রক্তবীজের দুই সঙ্গী অবাক হয়ে কালীর দিকে তাকালো। ব্যাপারটা কী ঘটেছে? মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

'কী হলো!', ধমক দিল কালী, 'যা বলছি, তাড়াতাড়ি করো।'

ওরা দুজন গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসে হাঁটুগেড়ে বসলো রক্তবীজের দেহের পাশে। নাড়ি ও হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করে দুজনেই মাথা নাড়লো।

চমৎকার! ভালো করে দেখেশুনে নিয়েছ, পরে কিন্তু বলবে না এসব মায়া।' বললে কালী, 'এবার তোমাদের আজগুবি বিশ্বাসটা সত্যি না মিথ্যা, সেটা যাচাই করে নেওয়া যাক। এখন সরো এখান থেকে, দূরে গিয়ে বসো।'

রক্তবীজের সঙ্গীরা সরে যেতেই যেন মন্ত্রবলে অন্ধকারের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হল কাপালিক তারক। দ্রুত রক্তবীজের ক্ষতস্থান ঔষধি পট্টি দিয়ে বেঁধে ফেললো। পায়ের দুটো বুড়ো আঙুল বেঁধে ফেললো একসঙ্গে। রক্তবীজের পরনের সব বস্ত্র ছিঁড়ে ফেলে দিল, সারা শরীর বিশেষ এক ভেষজের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দিল। ঠোঁট ফাঁক করে মুখের মধ্যে ঢেলে দিল দুর্গন্ধময় এক আরক। শুরু হলো নানান তান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও তার সঙ্গে উচ্চস্বরে মন্ত্রোচ্চরণ। প্রায় দু'দণ্ড পর মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দে রক্তবীজের মৃতদেহে কম্পন জাগলো। রুদ্ধশ্বাসে আরও কয়েকটি পল পার হয়ে গেল। রক্তবীজের মৃতদেহ হঠাৎ চোখ খুললো।

'এ-এ-এ অসম্ভব!' আতঙ্কে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো রক্তবীজের সঙ্গীরা।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই', বললো কালী, 'তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মৃত্যুর পর অর্ধদিবস পর্যন্ত মৃতকে জীবিত করা যায়। যাও, দেখো ওর হৃদপিণ্ড চলছে কিনা, ওর নাড়ি সচল কিনা। তারপর ওকে জিজ্ঞেস করো, মৃত্যুর পর ও কোথায় গিয়েছিল। কথামতো ওর শরীরের প্রথম রক্তবিন্দু মাটি স্পর্শ করামাত্র ও স্বর্গ দেখতে পেয়েছিল কিনা। সেখানে অসুপিতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিনা। স্বর্গের এতসব সুখভোগ ছেড়ে ফিরেই বা এল কেন ও। সবকিছু খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করো ওকে।'

হতভম্ব দুই অসুর রক্তবীজের পাশে গিয়ে বসল। রক্তবীজ ততক্ষণে উঠে বসেছে। ফিসফিস করে কথাবার্তা শুরু করলো ওরা। তিনজনেরই বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে গেছে আজ।

'মনে রেখো, আজ যা দেখলে জানলে, তা সবাইকে বলে বেড়াবে', বললো কালী, 'নাহলে কিন্তু আমি আবার ফিরে আসবো।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় তিন অসুরকে পেছনে ফেলে রেখে কালী অন্তর্হিত হলো জঙ্গলে। সঙ্গে কাপালিক তারক ও শক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা। সেদিন থেকেই এরকম চোরাগোপ্তা আক্রমণ শুরু হলো অসুরদের ওপর। মেরে ফেলা, বাঁচিয়ে তোলা। তার সঙ্গেই, ইতিহাসে প্রথমবার রক্তবীজদের সংখ্যা কমতে শুরু করলো।

স্বর্গ নেই? অসু সেখানে আমাদের পুরস্কৃত করার জন্য পরীক্ষা করছে না? তাহলে অসুবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে এই যে এত

পাপ করেছি সারা জীবনভর, তার কী হবে? রক্তবীজদের অনেকেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পাগল হলো, অনেকে আত্মহত্যাও করলো। কেউ বা অসুবাদ ও অসুরদের সব সংশ্রব ছেড়ে ঘোর সংসারী হয়ে পড়লো। কেউ বা আবার ধর্মত্যাগের অপরাধে অন্য অসুরদের হাতে খুন হলো। কিছু রক্তবীজ জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজতে খুঁজতে ফিরে এলো কালীর কাছে।

'মা', বললো রক্তবীজের দল, 'আমাদের রক্ষা করো। স্বর্গের লোভে সারাজীবন অগণিত পাপ করেছি। কর্মফলের চিন্তা আমাদের দিনরাত তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কী করে এর থেকে মুক্তি পাবো?'

'মুক্তির একটাই উপায়', বললো কালী, 'প্রায়শ্চিত্ত'।

'কী করে প্রায়শ্চিত্ত করবো, বলে দাও মা।'

'যেসব গালগল্প লোকেদের শিখিয়েছো, যেসবের জন্য এত অশান্তি, সেগুলোকে ভোলাতে হবে।'

'সেটা কীভাবে সম্ভব? যদি আমরা অসুরদের মধ্যে ফিরে যাই, অসুধর্মের বিশ্বাসগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলি, তবে সেই মুহূর্তেই ওরা আমাদের হত্যা করবে। অসুরদের সেটাই রীতি।'

'বলবার দরকার তো নেই যে, তোমরা অসুধর্ম ত্যাগ করেছো। শুধু বলবে, যে অসু সেই ঈশ্বর, দুই-ই সমান। বলবে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলো সবাই সেই সর্বশক্তিমান অসুর বিভিন্ন রূপ, তাই তাদের অসুজ্ঞানে ভক্তি করতে হয়। আর এটা তো মিথ্যে কথা নয়। কশ্যপপুত্র আদিত্যর তো এটাই বক্তব্য ছিল। অসুরদের বলবে, অসুবাদী ও প্রকৃতি-উপাসকদের মধ্যে বিভেদ না করতে। পরকালের ওইসব গল্পগুলো যে মিথ্যে, সেটা জোর দিয়ে বলবে। কেউ না মানলে আমি আসবো তাকে বোঝাতে। ওদের বলবে, প্রকৃতিপূজক পূর্বজদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে। আর বলবে, সামাজিক উৎসবগুলোতে যেন উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে সবাই। মেয়েদের অসম্মান করা, তাদের ওপর খবরদারি যেন বন্ধ হয়। তারা তাদের যা ইচ্ছে তাই করবে, ধর্মের নামে তাদের ওপর নিজেদের ইচ্ছে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। প্রকৃতিনির্ভর শিল্প-সাহিত্য নান্দনিকতার চর্চা যেন নতুন করে শুরু হয়। প্রকৃতিকে, এই ভূমিমাতাকে, এই মাতৃভূমিকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করা শেখাবে অসুরদের। অসুবাদী বলেই অন্যরকম নাম রাখতে হবে, এমন তো কোনো মানে নেই। সবাই যেন নিজের সন্তানের নাম রাখে স্বীয় অঞ্চলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। পোশাক-আশাক গৃহসজ্জায় স্বাতন্ত্র্য রাখার চেষ্টা বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে লেগে পড়ো, এই বাণী প্রচার করো অসুরদের মধ্যে। ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূভাগ, জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ আজ কেমন যেন অচেনা হয়ে গেছে। তাদের ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনতে হবে। এটা তোমাদের দায়িত্ব। অর্থের অভাব তোমাদের কাজে বাধা হবে না। আগে মহিষাসুর তোমাদের ভরণপোষণ চালাতো, এখন তোমাদের ভরণপোষণ চালাবে আমার বন্ধু কমলা। নিশ্চিন্তমনে কাজে লেগে পড়ো। দেশের যে ক্ষতি করেছ, যত দ্রুত সম্ভব তা পূরণ করো। মনে রেখো, আমি কিন্তু সর্বক্ষণ তোমাদের ওপর নজর রাখছি।'

পরবর্তী বছরগুলো মহিষের জন্য মোটেই ভালো কাটল না। বিশ্বাসীদের খুনোখুনিকে পুরস্কৃত করার জন্য মরণের ওপারে অসু প্রতীক্ষা করছেন, এই স্থির বিশ্বাস দিকে দিকে ভেঙে পড়তে লাগলো। নতুন করে দানববাহিনীতে আর কেউ যোগ দিতে আসে না। এর সঙ্গেই, আরামপ্রিয় স্থানু ক্ষয়িষ্ণু রাজশক্তিগুলোকে সরিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে নবীন রাজশক্তি রাজনীতির পরিসর দখল করলো। ভূমি থেকে উদ্গত নবীন এই রাজশক্তি প্রথম সুযোগেই মহিষাসুরের প্রাধান্য অস্বীকার করলো। মহিষের রাজকর আদায়ে ঘাটতি দেখা দিল। খণ্ডযুদ্ধের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু এবার দানবদের পিছু হটার পালা। বাড়তে লাগলো দানববাহিনীতে পলাতকের সংখ্যা। দানব প্রাধান্য সঙ্কুচিত হতে হতে শেষমেশ মহীশূরের আশপাশেই শুধু রয়ে গেল। দুর্গা বুঝলো, অন্তিম প্রহারের সময় সমাপন্ন।

বর্ষাকাল, ভারতবর্ষে যুদ্ধযাত্রার জন্য উপযুক্ত সময় নয়। বৃষ্টিতে রাস্তা ভেসে যায়, চলাচলের অযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে সৈন্য রসদ বাহন শকট সবকিছুকেই। তাই বর্ষার সময় সব নৃপতিরাই দুর্গে নিজেদের অবরুদ্ধ করে ফেলে। বিশ্রাম নেয়, প্রস্তুতি নেয় পরবর্তী যুদ্ধের জন্য। ঠিক এই সুযোগটাই নিল দুর্গা। ভরা বাদলে সবার নজর এড়িয়ে সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী জড়ো হলো গঙ্গানগরে। সেখান থেকে দুই হস্তীবাহিনী মিলিত হয়ে রওনা হলো দক্ষিণের পথে। বাকিরা পৌঁছলো ব্রঙ্গার সমুদ্রবন্দরে। ইতিমধ্যে ব্রঙ্গার সবকটি রণতরী এসে জড়ো হয়েছিল বন্দরে। সঙ্গে যোগ দিল কমলার বাণিজ্যপোতগুলো। সেনাবাহিনী, রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া— সবকিছু তোলা হলো জাহাজগুলোতে। মাঝখানে বাণিজ্যপোত, তাদের ঘিরে রাখলো রণতরী— মণ্ডলব্যূহ রচনা করে

Saraogi Udyog Private Limited

Importer & Merchants for Coal and Coke

21, Hemant Basu Sarani "Centre Point" Suit No. 212
2nd Floor, Kolkata - 700 001
Fax : +91-33-22435334, +91-33-22138782
Phone : +91-33-22481333 / 0674, +91-33-2213 8779/80/81
Email : saraogiudyog@eth.net
www.saraogiudyog.com

With Best Compliments From

A Well Wisher

S. N, Kejriwal

ব্রঙ্গাসাগরে পাড়ি দিল জাহাজগুলো। উপকূল ধরে জাহাজ চালিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই পৌঁছে গেল কাবেরী নদীর মোহনায়। সেখানে ব্যূহের পরিবর্তন হলো। সূচিব্যূহ রচনা করে নৌবাহিনী প্রবেশ করলো কাবেরী নদীতে। খরস্রোতা কাবেরীর উজান বেয়ে শেষমেশ পৌঁছলো মহাবলাচল পাহাড়ের সন্নিকটে। হস্তিবাহিনী ততদিনে পৌঁছে গেছে সেখানে। বর্ষাকাল শেষ হয়েছে। পরদিন সকালে সমগ্র বাহিনী পূর্বজদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিতর্পণ করলো কাবেরীর জলে। শেষবিদায় চেয়ে নিল পূর্বজদের কাছ থেকে। মহাবলাচল পাহাড়ের দু-দিকে রয়েছে কাবেরী ও তার শাখানদী। নদীর অপর পাড়ে দেবতাদের পদাতিক বাহিনীদের মোতায়েন করলো দুর্গা। যে দুদিকে নদীর বেষ্টনী নেই, সেই দুদিকে দুই হস্তীবাহিনী মোতায়েন হলো। মহীশূরকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে দুর্গা যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

শরৎ হেমন্ত পেরিয়ে শীতকাল এলো। সঙ্গে আবার নামলো বর্ষা। দুর্গ ছেড়ে বেরোনোর নাম নেই মহিষের। আর কতকাল এভাবে খোলা আকাশের তলায় দিন কাটবে? অস্থির হয়ে উঠলো দুর্গার সেনাদল। মরিয়া হয়ে কয়েকবার ঝটিকা আক্রমণ চালালো মহীশূরে দুর্গের ওপর। প্রতিবারই দুর্গপ্রাকারের উঁচু দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে নিরস্ত হতে হলো। ত্রিস্তরীয় দুর্গের প্রথম স্তরও ভেদ করা গেল না। এই দুর্গ কি সত্যিই অভেদ্য?

‘নিঃসন্দেহে’, বললো ভৈরবী। দুর্গপ্রাকার ভেদ করতে প্রতিটি প্রচেষ্টারই নেতৃত্ব দিয়েছিল ও। হতাশা ওরই সবচেয়ে বেশি।

‘বিস্ফোরক দিয়ে দুর্গপ্রাকার ভাঙা যায় না?’ মাতঙ্গী প্রশ্ন করলো ধূমাবতীকে।

‘নাঃ’, বললো ধূমাবতী, ‘যেই বানিয়ে থাকুক, বাইরের পাঁচিলগুলো বানিয়েছে জব্বর। এদিক থেকে ভাঙা যাবে না। ভেতরদিক থেকে চেষ্টা করলে হলেও হতে পারে।’

‘কে যাবে ভেতরে?’ বললো মাতঙ্গী।

‘আমি যেতে পারি’, বললো ভুবনেশ্বরী, ‘গরুড়পক্ষীতে চড়ে প্রাকারের উল্টোদিকে নামতে পারি।’

‘মনে হয় এই দুর্গের স্থপতি সেই সম্ভাবনাটাও ভেবে রেখেছে’, বললো ভৈরবী, ‘প্রতিটি প্রাচীরের ঘাড়ের ওপর প্রহরাকক্ষ বানিয়ে রেখেছে। দানবরা উড়ন্ত গরুড়পক্ষী সহ তোমাকে চাঁদমারি করে ফেলবে, জ্যান্ত মাটিতে নামতে দেবে না।’

‘তাহলে কী করা যায়?’ বললো দুর্গা।

‘যদি জোরদার একটা ভূমিকম্প হতো এখানে, তাহলে খুব ভালো হতো’, বললো কালী।

‘কেন?’ হঠাৎ যেন নিজের মস্তিষ্কের মধ্যে আলোর এক ঝলকানি দেখতে পেল দুর্গা, ‘একথা কেন বললে?’

‘দেখতে পাচ্ছো না’, দূরে মহাবলাচল পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললো কালী, ‘কতটা খাড়াই পাহাড়? তার ওপর বর্ষায় ভিজে পাথরগুলো নিশ্চয়ই আলগা হয়ে আছে। যদি ভূমিকম্প হয়, পাহাড় গড়িয়ে পাথরের ঢল নামবে। তাতে বাইরের প্রাকারের কিছুটা অংশ নিশ্চয়ই ভেঙে পড়বে। কিন্তু এসব ভেবে কী হবে? ভূমিকম্প কী আর আমাদের ইচ্ছেমতো হবে?’

‘কেন হবে না?’ বললো দুর্গা, ‘ধূমাবতী, তোমার কী মতামত? ইচ্ছেমতো ভূমিকম্প ঘটানো যায় না কি?’

‘কেন যায় না বাছা?’ বললো ধূমাবতী, ‘পাহাড়ের নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ঠিক ঠিক জায়গায় বিস্ফোরক পুঁতে ফেলতে হবে। সেইসব বিস্ফোরক একসঙ্গে ফাটলে ভূগর্ভে এক আলোড়ন সৃষ্টি হবে। তাতে যে পাথরের স্তরের ওপর পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে, সেটা নড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।’

‘তাহলে ধূমাবতী’, বললো দুর্গা, ‘সেই চেষ্টাই করা যাক।’

‘নিশ্চয়ই করবো বাছা’, বললো ধূমাবতী, ‘খুব মজার ব্যাপার হবে। কৃত্রিম ভূমিকম্প, পুঁথিপত্রে পড়লেও কখনো দেখিনি। তবে একটু সময় লাগবে। জরিপ করতে হবে জায়গাটা। তাছাড়া এই উল্টো বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিস্ফোরক নিয়ে কাজ করা যাবে না।’

‘সময় লাগে লাগুক’, বললো দুর্গা, ‘তুমি কাজে লেগে পড়ো।’

শীত গড়িয়ে বসন্ত এলো। ফুলের বান ডাকলো কাবেরী নদীর দুই তীরে। কদম্বফুলের মিষ্টি গন্ধে মাতোয়ারা রাতের আকাশ। আজ আকাশে চাঁদ নেই। অনন্ত অন্ধকারে ডুবে আছে মহাবলাচল পর্বত। অধীর পদক্ষেপে পায়চারি করছিল দুর্গা। রুদ্রকে এদিকেই আসতে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

‘সময় তো হয়ে এলো। তাই না?’ বললো রুদ্র।

‘হ্যাঁ’, বললো দুর্গা। অনুভব করলো, গলা শুকিয়ে আসছে ওর।

'দুর্গা', খুব কাছে এসে ডাকলো রুদ্র। আজ রুদ্রর স্বরে অচেনা এক আর্দ্রতা।

'বলো', কম্পিতস্বরে বললো দুর্গা। মনে হলো, পা-দুটো খুব দুর্বল হয়ে গেছে।

'আগামীকাল কী হবে জানি না', বললো রুদ্র, 'শুধু অনুরোধ, চেষ্টা করো বেঁচে ফিরে আসবার।'

'কেন বলছো একথা', অবরুদ্ধ স্বরে বললো দুর্গা।

'স্বার্থপরের মতো বলছি', বললো রুদ্র, 'এ যুদ্ধের শেষে কী হবে, কেউ জানে না। কিন্তু কোনো মূল্যেই তোমাকে হারাতে চাই না।'

দুর্গা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ওকে চুপ করিয়ে দিয়ে রুদ্র মহাদেব বললো,

'আজ এসব কথা কেন বলছি, জানি না। আমি জীবন্মুক্ত সাধক, চিত্তচাঞ্চল্য আমার শোভা পায় না। কিন্তু আজ বারবার মনে হচ্ছে, এই যুদ্ধের অবসানে তুমি ধরাধামে নাও থাকতে পারো। সেই আশঙ্কা আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না।'

সুদীর্ঘ এক শ্বাস নিলো দুর্গা। মনের সব শক্তি একজোট করে রুদ্রর বাম বাহুমূল চেপে ধরলো নিজের দক্ষিণ বাহু দিয়ে। আকাশের দিকে দৃষ্টিনির্দেশ করে বললো,

'ওই যে দেখছো ওই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি, ওটি বস্তুত দুটি নক্ষত্র। অনন্তকাল ধরে দু-জনে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। বনবাসীদের মধ্যে প্রথা আছে, বর-বধূ পরস্পরের হাত ধরে ওই নক্ষত্রযুগলের ধ্যান করে, সেটাই ওদের বিবাহ।'

অস্ফুটস্বরে কিছু বলার চেষ্টা করলো রুদ্র। সে কথা শেষ না করতে দিয়ে দুর্গা বললো,

'মনে রেখো— এই জন্ম, এই জীবন দেশের জন্য, সমাজের জন্য উৎসর্গীকৃত। কিন্তু জন্মজন্মান্তরে আমি তোমার, তুমি আমার।'

পরস্পরের আলিঙ্গনে অনৈসর্গিক এক তৃপ্তিতে ভরে গেল যুগলের মনপ্রাণ। দূর হয়ে গেল সব আশঙ্কা, সব ভীতি। কয়েক মুহূর্ত পার হয়ে গেল। হঠাৎ দুরুদুরু কেঁপে উঠলো মাটি। দূর থেকে ভেসে এলো ধূমাবতীর খনখনে গলায় উল্লাস। গুড়গুড় শব্দের সঙ্গে পাথরের স্রোত গড়িয়ে নামতে শুরু করলো পাহাড়ের গা বেয়ে। প্রথমে ছোটো ছোটো পাথর, তারপর বড় পাথর। শেষে তুমুল শব্দ করে হিমানীসম্প্রপাতের মতো পাথরের ঢল নামলো। যখন সে ঢল থামলো, দেখা গেল, জায়গায় জায়গায় দুর্গের প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। ভেঙে পড়েছে সৈন্যাবাস, প্রহরাকক্ষ। পাথরে চাপা পড়ে মারা গেছে অসংখ্য দানবসেনা। দ্রুত দুর্গার প্রতিটি বাহিনী সমবেত হলো পর্বতের পাদদেশে।

'বন্ধুরা', কম্বুকণ্ঠে দেবতাদের বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললো দুর্গা, 'দুর্গভেদের সময় সমাগত। মহিষাসুর তোমাদের ভাই-বোনদের ওপর যে অকথ্য নির্যাতন করেছে, স্মরণ করো সেসব কথা। চলো, আজ আমরা মহিষাসুরের অত্যাচারের পরিসমাপ্তি করি।'

বেজে উঠলো দুন্দুভি, বাজলো কাড়া-নাকাড়া। উদ্যত খড়্গ হাতে দুর্গা দৌড়লো দুর্গের দিকে। সঙ্গে ভৈরবী, কালী ও ষোড়শী। পেছনে দেবতাদের সুবিশাল বাহিনী। ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লো দেবসেনা। বন্যার জলের মতো ছড়িয়ে পড়লো দুর্গের প্রথম স্তরের সর্বত্র। ভগ্ন দুর্গের অলিন্দে প্রলয়ংকর এক যুদ্ধ শুরু হলো। শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ, শস্ত্র হারালে হাতাহাতি যুদ্ধ। প্রতিটি পদক্ষেপে দানবসেনা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দিলো দেবতাদের সঙ্গে। কিন্তু দেবতারা সংখ্যায় অগণিত। প্রতিশোধ গ্রহণের এই সুযোগের প্রতীক্ষায় তারা ছিল বহুদিন। দানবদের মেরে একটু একটু করে দেবতারা পরিসর দখল করতে লাগলো। পাঁচদিন যুদ্ধ চলার পর সূর্যাস্তের সঙ্গে দ্বিতীয় প্রাকার ভেঙে দুর্গের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করলো বাহিনী।

আরেকটা খণ্ডযুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েই দেবতারা ঢুকেছিল দ্বিতীয় স্তরে। অবাক হয়ে দেখলো, ময়দান ফাঁকা। কোথায় গেল দানবরা? পরমুহূর্তেই দেবতারা দেখলো, সাঁঝের আঁধারে হাজার হাজার খ্যাপা মোষ শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে ওদের দিকে। প্রাণভয়ে পালাতে লাগলো দেবতারা। অবাক হয়ে দুর্গা দেখলো, দেবতারা পালিয়ে যেতেই মোষের পাল যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পালিয়ে গিয়ে দুর্গের দ্বিতীয় প্রাকারের ঠিক বাইরে জড়ো হয়েছিল দেবতারা। দুর্গা পৌঁছলো সেখানে। এক্ষুনি কী দেখেছে, তা বললো ইন্দ্রকে।

'বাতাসে মিলিয়ে গেল', আশ্চর্য হলো ইন্দ্র, 'হয়তো আপনার চোখের ভুল!'

'পাহাড়ের এত উঁচুতে এত বিশাল সংখ্যায় মোষ কীভাবে জড়ো হলো? সন্দেহ হচ্ছে না তোমার?' বললো দুর্গা।

'হয়তো এসব দানবদের পোষা মোষ।' বললো ইন্দ্র।

'এত বিশাল সংখ্যায়?' বললো দুর্গা, 'এই অবরোধের মধ্যে তাদের খাইয়ে পরিয়ে রেখেছে গত ছ-মাস ধরে? সেটা কী আদৌ সম্ভব? আমি বলছি, এ আর কিছুই না, এ হলো মায়া। অন্ধকারে আলোর প্রতিফলন ব্যবহার করে এক মহিষকে একশত দেখাচ্ছে ওরা। বিস্তর বোকা বানিয়েছে মহিষাসুর।

চলো, আবার আক্রমণ করা যাক।'

দুর্গার নেতৃত্বে আবার দেবতারা আক্রমণ করলো। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। এবার তো দেবতারা জানে এ সবই মায়া, তবু রণোন্মত্ত মোষদের তেড়ে আসতে দেখলেই প্রাণভয়ে পালাচ্ছে দেবতারা। যেন জগতের সব ভয় একসঙ্গে ভর করেছে ওদের শরীরে। বারংবার আক্রমণ ও পলায়ন, আরও দুদিন কেটে গেল এই করে। দুর্গের প্রথম স্তরেই সীমাবদ্ধ রইল দুর্গার বাহিনী। উল্টে এবার দুর্গের তৃতীয় স্তর থেকে অস্ত্রবর্ষণ শুরু হলো। বহু সংখ্যক দেবতা প্রাণ হারালো। সবার ক্ষতস্থান মেরামতের পর মাঝরাতে জরুরি বৈঠক ডাকলো দুর্গা।

'ভেবেছিলাম প্রথম দুর্গপ্রাকারের পতন হলেই কেল্লাফতে হবে', বললো দুর্গা, 'আজ অষ্টম দিন। গত আটদিন ধরে দুর্গপ্রাকার একপ্রকার অরক্ষিত। তবু আমরা মহিষকে হারাতে পারিনি। নিজের সৈন্যবল অটুট রেখে ক্রমাগত আমাদের শক্তিক্ষয় করে চলেছে সে। এভাবে চললে আমাদের পরাজয় নিশ্চিত।'

'আমার সেনার আচরণে আমি অতীব লজ্জিত', বললো ইন্দ্র, 'এরা সবাই জাত যোদ্ধা। বহু ভীতির সম্মুখীন হয়েছে এরা জীবনে। কিন্তু এখানে এসে বারবার কেন এরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাচ্ছে, সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।'

'কী এই সমবারি মায়া?' বললো রুদ্র, 'এর উৎস কী?'

'একটা ব্যাপার', বললো দুর্গা, 'মোষের পালকে দৌড়ে আসতে আমিও দেখেছি। কিন্তু সেটা যে মায়া, তা বুঝতে আমার দেরি হয়নি। সেটা বুঝতে পারলাম, কারণ আমি ভয় পাইনি। অথচ দেবতারা ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারাচ্ছে। কেন? এ কী অদ্ভুত ধাঁ-ধা!'

'বাছা', বললো ধূমাবতী, 'তোমার সঙ্গে ভৈরবী ছিল, ষোড়শী ছিল, কালী ছিল। ওরাও কি ভয় পেয়েছিল?'

'আমি কোনো কিছুকেই ভয় পাই না'। গর্বভরে বললো ভৈরবী।

'আমি বিস্তর পাই', বললো ষোড়শী, 'কিন্তু তখন পাইনি। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে, ওরা আমাদের অস্ত্র আমাদেরই ওপর প্রয়োগ করছে।'

'তার মানে?' বললো কালী।

'মনে আছে তো', বললো ষোড়শী, 'ব্রঙ্গার যুদ্ধে দানবদের ওপর এক বিশেষ রসায়ন প্রয়োগ করেছিলাম আমরা। যার প্রভাবে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল ওরা। সেই একই রসায়ন ওরা এবার আমাদের ওপর প্রয়োগ করেছে।'

'কিন্তু সে তো... মাতঙ্গী রাঁধুনী সেজে ওদের মধ্যে ঢুকে ওদের খাবারে সেই রসায়ন মিশিয়েছিল। এক্ষেত্রে...'

'সেই একই রসায়ন কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের মাধ্যমে হয়তো বায়বীয় পদার্থে রূপান্তরিত করা যায়। মহিষের লোকেরা সেই রসায়ন দুর্গের চূড়া থেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। বাতাসে ভেসে সে রসায়ন নেমে এসেছে নীচের দিকে। রসায়নে সম্পৃক্ত হয়ে ভয় পেয়েছে দেবতারা।'

'কিন্তু আমাদের ওপর সেই রসায়নের প্রভাব সেভাবে হলো না কেন?' কালীর প্রশ্ন।

'নারী ও পুরুষের শরীরে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলোর কাজ অনেকটাই ভিন্ন', বললো ষোড়শী, 'মনে করে দ্যাখো, সেই ব্রঙ্গার যুদ্ধের সময়েই আমি বলেছিলাম, এই রসায়নের প্রভাব শুধু পুরুষদেরই ওপর পড়বে। নারী শরীরের ওপর এই রসায়নের প্রভাব খুবই সীমিত।'

'এতক্ষণে রহস্য পরিষ্কার হলো', বললো দুর্গা, 'তা, এই রসায়নের কোনো প্রতিষেধক বানাতে পারবে তুমি?'

'ব্রঙ্গায় থাকলে হয়তো পারতাম', বললো ষোড়শী, 'এখানকার জঙ্গল আমার অচেনা। এখানে কোন জঙ্গলে প্রতিষেধক উদ্ভিদ খুঁজে বেড়াবো?'

'তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে', বললো দুর্গা, 'একমাত্র মেয়েরাই দুর্গ আক্রমণ করতে পারবে। খুব ভালো। তাহলে চামুণ্ডাবাহিনীই পরবর্তী আক্রমণে যাবে।'

'আমার ভূতপ্রেতের দলও যেতে পারে সঙ্গে', বললো রুদ্র, 'তারা জীবন্মুক্ত সাধক, গ্রন্থির নিঃসরণ তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে। উপরন্তু প্রমথরা গঞ্জিকাসেবনে অভ্যস্ত। এই রসায়ন তাদের ওপর খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারবে না।'

'তবে তাই হোক', বললো দুর্গা, 'আজ যুদ্ধের অষ্টম দিন শেষ হলো। আগামীকাল নবমী। আগামীকাল আমরা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়েই ছাড়বো। ভৈরবী, এই যুদ্ধে তুমিই হবে সেনাধ্যক্ষা। তুমি চামুণ্ডাসেনাকে প্রস্তুত করো। আগামীকাল সূর্য ওঠার সাথেই আমরা আক্রমণ করবো।'

অষ্টমীর শেষ প্রহর। ময়লা একটা চাঁদ পশ্চিম আকাশের দিকে গুটিগুটি এগোচ্ছে। তার আলোয় আলো কম, আঁধার বেশি। কাবেরী নদীর তীরে উঁচু একটি পাষাণ-বেদিকা বেছে নিয়ে তার ওপর ধ্যানে বসলো দুর্গা। চোখ বন্ধ করার সঙ্গেই

With Best Compliments From -

W L

Willowood Chemicals Private Limited

MK Point

AT 27, BENTINCK STREET,KOLKATA

AGRAWAL & AGRAWAL
Architects Planners Interior Designer

A World-class (B+G+7 Storied) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata- 700 001

By

M K GROUP

Contact no. 033-32901999

www.mkpoint.in

একরাশ অন্ধকার দৌড়ে এলো দশদিক থেকে। সেই আঁধারে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করলো দুর্গা। পেঁজা তুলোর মেঘের মতো চিন্তার স্রোত বয়ে এলো, চলে গেল। মন্ত্র জপের সঙ্গে ফিকে হয়ে এলো সেই মেঘের ঝাঁক। শেষে রয়ে গেল অসীম এক শূন্যতা। ধীরে ধীরে সেই শূন্যতায় জাগলো অলৌকিক এক আলোর আভা। দুর্গা দেখলো, অনন্ত চিদাকাশে নিরলম্ব অবস্থায় বসে আছে ও। সামনে ধ্যানাসনে নিমীলিত চক্ষে যোগিনী। দুর্গার তন্ত্রগুরু। যোগিনী চোখ খুললো।

'তুমি কি সত্যিই এখানে', 'দুর্গা প্রশ্ন করলো, 'নাকি এটা আমার কল্পনা?'

'স্বপ্নের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ একটা জগৎ সৃজন করি। সেটা সত্যি, না কল্পনা?'

'সেটা কল্পনা।'

'কল্পনা? তাহলে তুই দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পাস কেন? নিজের কল্পনাকেই ভয়? এ কেমনধারা বাস্তব?

দুর্গা নিরুত্তর।

'মায়াজাল ছিন্ন করার উপায়', বললো যোগিনী, 'বস্তু যে মায়া, সেটা উপলব্ধি করা।'

'নদীতে যে ছায়া পড়ে, সেটাও তো মায়া। কিন্তু যতই ভাবি ওটা প্রতিবিম্ব, সে প্রতিবিম্ব তো আর উধাও হয়ে যায় না। দর্পণে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে চোখ ঝলসে দেয়। দর্পণের সেই সূর্য যে মায়া, সেটা উপলব্ধি করলেই কি আমি নিরাপদ থাকবো? চোখ ঝলসাবে না?' প্রশ্ন দুর্গার।

'প্রতিবিম্বের মায়াকে বিনষ্ট করতে গেলে দর্পণকে চূর্ণ করতে হবে', বললো যোগিনী, 'তাহলেই প্রতিবিম্ব বিলীন হবে। মৃৎপাত্র মায়া। তাকে ভেঙে ফেললেই জানা যায়, মৃৎপাত্র মৃত্তিকা বই আর কিছু নয়। মনে রাখিস, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গে ছলনা করে। বিশ্বাস করিস না তাদের।'

'সেটা কী রকম?' প্রশ্ন করলো দুর্গা।

'ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা হলো, জীবনরক্ষা। শিকার করা, শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া। ইন্দ্রিয়রা এর বাইরে আর কিছু বোঝে না। বুদ্ধিমান কেউ যদি ইন্দ্রিয়দের এই দুর্বলতাটুকু বুঝে ফেলে, তাহলে সে তোর ইন্দ্রিয়কেই তোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে।'

'ঠিক যেমন মহিষ রসায়ন ব্যবহার করে দেববাহিনীকে ভয় দেখিয়েছে।'

'ঠিক তাই। জেনে রাখিস, ইন্দ্রিয়রা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন জীবনরক্ষার জন্য ইন্দ্রিয়দের ভোঁতা করে দিতে হয়।'

'সেজন্যই কি শিবপ্রমথরা গঞ্জিকাসেবন করে?'

অপার্থিব আলো শেষরাতের অন্ধকারে বিলীন হলো। চিদাকাশ হলো অন্তর্হিত। চোখ খুললো দুর্গা। চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। ঝাপসা আঁধারে প্রকাণ্ড এক মহিষের মুকুটের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মহাবলাচল পর্বত। দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে ভৈরবী, সঙ্গে চামুণ্ডাবাহিনী। ধ্যানাসন থেকে উঠে দাঁড়ালো দুর্গা। কটিবন্ধ থেকে খড়্গ খুলে রাখলো পাষাণ-বেদিকার ওপর। ভৈরবী ওর কুঠার রাখলো তার পাশে। একে একে বাহিনীর প্রত্যেকে তাদের আয়ুধ জড়ো করলো সেখানে। সিঁদুর মাখানো হলো সেগুলোতে। গম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলো দুর্গা। পাপসংহারে জেগে ওঠার জন্য আহ্বান করলো আয়ুধের অন্তর্নিহিত শক্তিকে। দুর্গার সঙ্গে গলা মেলালো বাহিনীর মেয়েরা। পুজো যখন শেষ হলো, অষ্টমী তখন শেষ হয়ে নবমীতে পড়েছে। একে একে বাহিনীর সবাই নিজ নিজ আয়ুধ ধারণ করলো। তারপর বেরিয়ে পড়লো শেষ যুদ্ধ জয় করতে।

দুর্গের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করলো দুর্গা। সঙ্গে চামুণ্ডাবাহিনী ও শিববাহিনী। দেখলো, দানববাহিনী প্রতিরোধ-ব্যূহ রচনা করে প্রতীক্ষা করছে সেখানে। দানবদের নেতৃত্ব যারা দিচ্ছে, তারা অনেকেই মধ্যভারতের যুদ্ধে চামুণ্ডাদের হাতে বিধ্বস্ত হয়েছিল। উদ্ধত, উগ্রস্য, উগ্রবীর্য, মহাহনু, করাল ইত্যাদি। এবার আর মায়াজাল নয়, এবার সরাসরি যুদ্ধ। হা-র-র-র হুংকারের সঙ্গে চামুণ্ডাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো দানবদের উপর। সারাদিন ধরে চললো সেই প্রলয়ংকর যুদ্ধ। এক এক করে দানবদের নেতৃবর্গ মৃত্যুক্রোড়ে ঢলে পড়তে লাগলো। ভৈরবী তার মুষ্টিপ্রহারে দানব করালের করোটি ফাটিয়ে দিল। গদাঘাতে তারা ধরাশায়ী করলো উদ্ধতকে। ভুবনেশ্বরীর অঙ্কুশের আঘাতে উগ্রাস্যর মস্তক দেহচ্যুত হলো। ছিন্নমস্তার কাটারির ফলা উগ্রবীর্য ও মহাহনুর কণ্ঠা চিরে ফেললো। কালী ভিন্দিপালের আঘাতে বাস্কলকে, বগলামুখী বাণপ্রহারে তাম্র ও অন্ধককে বধ করলো। মাতঙ্গীর অসির প্রহার বিড়ালাক্ষর মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করলো। দুর্গা বাণের আঘাতে দুর্ধর ও দুর্মুখকে হত্যা করলো। অসিলোমার দুই চোখ ঠুকরে খেলো ধূমাবতীর

Best Compliments
from-

A
Well
Wisher

LIL

An ISO 9001 : 2008 Certified Company
Alloy Group

UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD.
AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.
RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.

Aluminium & Hardware People

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
AN ISO 9002 COMPANY JINDAL ALUMINIUM LIMITED
NALCO Aluminium Sheet Coil
DALOM Aluminiuam Extruded Section

503, **Kamalalaya Centre,** 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA
Phone : 4050 3400
E-mail : info@alloyindia.com **Website :** www.alloyindia.com

দাঁড়কাক। পরিবারিত নিহত হলো ষোড়শীর নাগপাশের দংশনে। প্রতিটি দানবকে খুঁজে খুঁজে বার করে হত্যা করলো চামুণ্ডারা। দুর্গের দ্বিতীয় স্তরের পতন হওয়ার সঙ্গেই সূর্যদেব অস্ত গেলেন পাহাড়ের ঢালে। সন্ধ্যা নামলো।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মাঝখানে ছিল ধাতুনির্মিত এক দরজা। বগলামুখীর বিস্ফোরক-বাণে চূর্ণ হলো সেটা। দুর্গের অন্তিম স্তরে প্রবেশ করলো দুর্গা। সঙ্গে চামুণ্ডা ও প্রমথ বাহিনীদ্বয়। তাদের এক হাতে উদ্যত আয়ুধ, অন্যহাতে জ্বলন্ত মশাল। অন্ধকারে ডুবে আছে মহাবলাচল পর্বতের চূড়ায় বিধ্বস্ত দুর্গের ধ্বংসস্তূপ। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বিরাট সব পাথরের টুকরো। ভাঙা দেওয়াল, হেলে পড়া খাম্বা। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়ালো দুর্গা ও মহিষাসুর। ওদের চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ালো চামুণ্ডার দলবল। দুর্গা অবাক হলো একাকী মহিষাসুরকে দেখে। চোখের কোণে কালি, মুখে ক্লান্তির ছাপ। এই কি সেই বিশ্বত্রাস দানব? আজ একলা এসেছে নিজের ভবিতব্যের মুখোমুখি হতে? হা-হা করে হেসে উঠলো দুর্গা। ডেকে বললো,

‘তোর জন্য আমার করুণা হচ্ছে। সারাজীবন তুই নারীদের অবজ্ঞা করেছিল, অশ্রদ্ধা করেছিস। তোর কী দুর্দৈব দ্যাখ, আজ তোর সামনে তোর কালান্তক যমরূপ উপস্থিত তোর চেয়ে শক্তিশারী এক নারী। কী করে বাঁচবি তুই আমার হাত থেকে? একমাত্র আশা ছিল তোর ওই সমবারি মায়া। কিন্তু এখানেও তোর ভাগ্য তোর সঙ্গে পরিহাস করেছে। তোর ওই মায়ার প্রভাব মেয়েদের ওপর পড়ে না। কী করবি এখন?’

‘সমবারি মায়াই একমাত্র মায়া নয়’, বললো মহিষাসুর। হঠাৎই যেন অস্বাভাবিক রকমের শান্ত শোনালো ওর কণ্ঠস্বর। ‘আরও অনেকরকম মায়া রয়েছে। সম্মোহন, অভিভাবন, মনোযোগ হরণ, যন্ত্রের ব্যবহার। আজ সেইসব নিয়েই আমি যুদ্ধে নামবো। গত ছ’মাস নির্বাসনে বসে মায়া নিয়েই তো আমি গবেষণা করে গেছি। জানতাম, একদিন না একদিন ব্রঙ্গাহ্নদিদের মায়াজালের মুখোমুখি হতে হবে আমাকে।’

আচমকা পেছন ফিরল মহিষাসুর। মহিষের ভঙ্গিতে তেড়ে গেল চামুণ্ডাদের দিকে। মহিষের মতোই শিঙের মুকুটের সাহায্যে আক্রমণ চালালো। লাফিয়ে উঠে পায়ের আঘাতে ভূতলশায়ী করলো একসঙ্গে একাধিক যোদ্ধাকে। ঠিক যেমন মহিষ তার পেছনের পা ব্যবহার করে আক্রমণ করে। পরমুহূর্তেই অন্ধকারের গর্ভ থেকে উঠে এলো মহাকায় এক মহিষ। লাফিয়ে তার পিঠে আরোহী হলো মহিষাসুর। মহাকায় সেই মহিষের শরীর পুরু ধাতব বর্মে ঢাকা। অদ্ভুত সে বর্ম। রাশি রাশি ছিদ্র সেই বর্মে। বর্মে ছিদ্র কেন? ভেবে কুলকিনারা পেলো না দুর্গা। দেখতে দেখতে মহিষ চড়াও হলো চামুণ্ডাবাহিনীর ওপর। তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো বাহিনীর যোদ্ধারা, ভয়ে পালাতে লাগলো। দুর্গা দেখলো, মহিষ-বাহনের বর্মের ছিদ্রপথ থেকে তেজঃপুঞ্জ নির্গত হচ্ছে অবিরল। যেখান দিয়ে মহিষের বাহন দৌড়ে গেল, তেজাবদগ্ধ মৃতদেহের স্তূপ ছড়িয়ে পড়লো সেই পথের দুপাশে। মহিষাসুর ও তার বাহন পলায়নরত চামুণ্ডাদের ক’জনকে মুখাঘাতে, কাউকে খুরাঘাতে, কাউকে বা শৃঙ্গদ্বারা বিদীর্ণ করলো। তাড়া করে ভূতলশায়ী করলো অনেককে। চামুণ্ডাদের বাঁচাতে দৌড়ে এলো প্রমথরা, হুংকারে আকাশ বিদীর্ণ করে একজোটে ঝাঁপিয়ে পড়লো মহিষের ওপর। কেউ আগুনে পুড়ে মরলো, কেউ বা মহিষ ও তার বাহনের শিং বা খুরের আঘাতে। তবু লড়াই চালিয়ে গেল শিববাহিনী। একজন মরলে আরেকজন তার জায়গা নিল। প্রমথদের প্রতিরোধে সাহস পেয়ে চামুণ্ডারাও নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ক্রমাগত আঘাতের ফল ফলল এবার। শ্রমনার ছোঁড়া তির বর্মের ফাঁক ভেদ করে আঘাত করলো বাহনের পায়ে।

ক্রোধে খুর দিয়ে ভূতল বিদীর্ণ করে সেই মহিষ শৃঙ্গের আঘাতে রাশি রাশি পাথর ছুঁড়তে লাগলো চারিদিকে। কিন্তু পায়ে আঘাত লেগেছিল মোক্ষম। ক্রমে মহিষের গতি শ্লথ হয়ে পড়লো। এই সুযোগে উদ্যত ছুরিকা হাতে মালিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো মহিষের ওপর। নিজের ভূতপূর্ব অঙ্কশায়িনীকে দেখে অবাক মহিষাসুর আর্তনাদ করে উঠলো। মুহূর্তে আগুনে ঝলসে গেল মালিনীর শরীর। কিন্তু তার আগেই ওর হাতের ছুরিকা বাহনের বামচক্ষু বিদীর্ণ করলো। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে খুরের আঘাতে ধুলোর ঝড় তুলে মহিষের বাহন খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়লো দুর্গার অভিমুখে। ধূমাবতী ছুঁড়ে দিল ওর মন্ত্রঃপূত ধুলো। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর আড়ালে অদৃশ্য হলো দুর্গা। সেখানে আবির্ভূত হল ষোড়শী, ওর হাতের নাগপাশ ছুঁড়ে দিল বাহনের দিকে। হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়লো বাহন। বাহনকে ত্যাগ করে মহিষাসুর উঠে দাঁড়ালো।

মাটি কেঁপে উঠলো সিংহনাদে। অবাক হয়ে দুর্গা দেখলো, চিঙ্কার থেকেও বিশালাকৃতি এক সিংহ আবির্ভূত হয়েছে রণাঙ্গনে। গা থেকে দাউদাউ আগুন ছুটছে তার। সিংহ! আমার চিঙ্কার মতোন একটা সিংহ! আক্রমণে হাত উঠলো না দুর্গার। অলৌকিক এই সিংহ এখানে কোত্থেকে এলো? ভাবতে গিয়েই দুর্গা হঠাৎ খেয়াল করলো, এতবড় একটা সিংহ দেখেও চিঙ্কা নির্বিকার। ব্যাপারটা কী? দুর্গা দেখলো, সে সিংহ সোজা দৌড়েছে ষোড়শীর দিকে। পরমুহূর্তে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর পেছনে

অন্তর্হিত হল ষোড়শী, তার জায়গায় দেখা দিল ভৈরবী। রণকুঠারের আঘাতে বিদীর্ণ হলো সিংহের করোটি, কুঠার আটকে গেল করোটিতে। স্তম্ভিত ভৈরবী দেখলো, সিংহচর্মের আড়াল খসে পড়লো, বেরিয়ে এলো হাড়-জিরজিরে সামান্য এক মহিষ। বোঝা গেল, সিংহচর্মের ওপর বিশেষ এক রসায়নের প্রলেপ ছিল, মশালের আলো যার গায়ে প্রতিফলিত হয়ে আগুন-সিংহের রূপ নিয়েছিল। অবাক হওয়ার সেই ঘোর কাটতে না কাটতে অন্ধকারের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হলো মহিষাসুর। সিংহেরই ভঙ্গিতে নখ ও দাঁতের সাহায্যে লড়াই চালালো। ভৈরবীর পদাঘাতে ছিটকে পড়লো সিংহরূপী মহিষ। পরমুহূর্তেই দ্বিগুণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র ভৈরবীর ওপর, হাতে খড়্গ ও ঢাল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠলো, ভৈরবীর স্থলে আবির্ভূত হল বগলামুখী। বাণবর্ষণের ঝড় উঠলো, সেই ঝড়ে উড়ে গেল মহিষাসুরের খড়্গ ও ঢাল। লৌহজালিকের জন্য সে বাণ মহিষের অঙ্গভেদ করতে পারলো না, কিন্তু সজারুর মতো হয়ে দাঁড়ালো মহিষাসুরের বর্ম, ঝড়ের আঘাতে ছিটকে পড়লো মাটিতে। স্তম্ভিত মহিষাসুর ভাবলো, এই মেয়েটির কি দশটা হাত? দশ হাতে দশ অস্ত্র? মনে হচ্ছে, দশটি মানুষের শক্তি নিয়ে একযোগে আক্রমণ করেছে একজন। মহিষাসুর দেখলো, ধনুর্বাণের বদলে গদা হাতে তুলে নিয়েছে মেয়েটি। যেন কালান্তর যম হাতে যমদণ্ড নিয়ে সংহারে উদ্যত। ভয়ে কেঁপে উঠলো ওর অন্তরাত্মা।

দুর্গা দেখলো, পাহাড়প্রমাণ এক মত্তহস্তী দৌড়ে যাচ্ছে বগলামুখীর দিকে। ব্রহ্মার হস্তী। শিশুকাল থেকেই তো হস্তীশাবকদের সঙ্গে খেলা করে বেড়ে ওঠা। আবার মমতা ওর হাত টেনে ধরলো। কিন্তু আকারে এ তো ব্রহ্মার হাতিদেরও চতুর্গুণ। কোত্থেকে এল এই প্রাগৈতিহাসিক হস্তী? পরমুহূর্তে বগলামুখীর জায়গায় আবির্ভূত হলো মাতঙ্গী। হাতির শুঁড় ধরে মারলো টান। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো যন্ত্রচালিত হাতির কাঠামো। তার আড়াল থেকে দেখা দিল মহিষাসুর। শান্ত, হতাশ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, মহিষ বোধহয় আত্মসমর্পণ করবে। পরমুহূর্তেই ওর চারপাশে আবিভূত হলো কুণ্ডলীকৃত কুজ্ঝটিকার এক বলয়। তার অন্তরালে অন্তর্হিত হলো মহিষাসুর।

কোথায় গেল মহিষ? চিঙ্কা বাতাসে নাক তুলে বারবার গন্ধ শুঁকলো। তারপর হতাশায় মাথা নেড়ে নিষ্ফল গর্জন করে উঠলো। নেই, কোথাও নেই। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে সে। কী হলো? আবার পালিয়ে গেল মহিষ? এত পরিশ্রম, এত বলিদান, সব ব্যর্থ? কোথায় পালিয়ে গেল? কীভাবে পালিয়ে গেল? এক মুহূর্ত আগেও তো সে এখানেই ছিল!

'ভিন্ন সময়ের মাত্রা।'

'কী? কী বললে?' চমকে উঠে দুর্গা দেখলো, মহিষ যে বিন্দুতে অন্তর্হিত হয়েছে, কালী দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেইখানে। হাতদুটো সামনে বাড়ানো, চোখ কপালে উঠে গেছে ওর। দরদর করে ঘামছে, শরীর থরথর করে কাঁপছে।

'ভিন্ন সময়ের অন্তরালে লুকিয়েছে মহিষ!' বললো কালী, এই বলেই বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলো। এলোমেলো পদক্ষেপে সম্মোহিতের মতো এগিয়ে এলো ছিন্নমস্তা, নিজের বামহাত দিয়ে কালীর ডানহাত আঁকড়ে ধরলো। পরমুহূর্তেই ডানহাত দিয়ে নিজের বক্ষমূলে আঘাত করলো। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোলো। শরীর থেকে বেরিয়েই সেই রক্তস্রোত রূপ নিল শুভ্রবর্ণ এক আলোকচ্ছটার। সেই মুহূর্তেই কালীর শরীর ভাস্বর হলো কৃষ্ণবর্ণ এক শক্তিপুঞ্জে। দুই শক্তি মুখোমুখি সংঘর্ষে রূপ নিল ঘূর্ণিঝড়ের।

'দুগা!' চিৎকার করে উঠলো কালী।

দুর্গা লাফিয়ে চড়ে বসলো চিঙ্কার পিঠে। চিঙ্কা ঝাঁপ দিল ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র অভিমুখে। বাহনসহ দুর্গা অদৃশ্য হলো অন্ধকারের অতলে।

যেন এক অনন্ত সুড়ঙ্গ। তার মধ্যে দিয়ে দৌড়ে চললো চিঙ্কা, অনন্তকাল ধরে। সে সুড়ঙ্গের দশদিকে অগণিত রঙের মেলা, অজস্র জ্যামিতিক আকৃতি। আকৃতিগুলো ভাঙছে, জুড়ছে। নতুন আকৃতি, নতুন রঙের সৃষ্টি করছে। এ যেন এক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ঘূর্ণি, যার আদি নেই, অন্ত নেই। সম্পূর্ণ চেতনা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে অতিজাগতিক সংগীতে। সে সংগীতের মূর্ছনা, তার অনুরণন, অশ্রুতপূর্ব সে, জাগতিক কোনো সংগীতের সঙ্গে তুলনা নেই তার। হঠাৎ সে সংগীত ফিকে হয়ে এলো, সব রঙ ঝাপসা হয়ে গেল অসীম অন্ধকারে। শরীরের সমস্ত রোমকূপ জুড়ে ভয়ে শিহরণ খেলে গেল দুর্গার। সূক্ষ্ম শরীর নয়, সুক্ষশরীরের প্রতিটি তন্ত্রী কেঁপে উঠলো অজানা আশঙ্কায়। দূরে আবছায়া একটা আলো দেখা দিল। দুর্গা দেখলো, রক্তচক্ষু এক মহিষ শিং উঁচিয়ে দৌড়ে আসছে ওর দিকে। ভয় সামলে উদ্যত খড়্গ দিয়ে সবলে আঘাত হানলো দুর্গা। বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেল মহিষ, তার জায়গায়

আবির্ভূত হলো এক বাঘ। আবার আঘাত হানলো দুর্গা। বাঘ পরিবর্তিত হলো বন্য বরাহে। বরাহ থেকে সিংহ। সিংহ থেকে খড়্গাচর্মধারী পুরুষ, তার থেকে হাতি, হাতি থেকে আবার মহিষ। চারদিক থেকে বারংবার আক্রমণ, প্রতিহত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো দুর্গা। মাথার মধ্যে কিলবিল করছে একরাশ অশরীরী। সবকটা ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়ে বলে চলেছে— বিপদ! বিপদ! কিন্তু শরীর যে আর লড়তে পারছে না। লড়াই করেই বা লাভ কী হবে? ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে কে কবে জিতেছে? ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীর জুড়ে অসংখ্য ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হচ্ছে অবিরাম। মনসংযোগ করার ক্ষমতাটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ কী অদ্ভুত মায়াজাল! হতভম্ব একরাশ চিন্তার জটাজালে আবদ্ধ দুর্গার মনে পড়লো, তন্ত্রে সূক্ষ্মশরীর নিয়ন্ত্রণের তিনটি স্তর রয়েছে। নিজের সূক্ষ্মশরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ, অন্যের সূক্ষ্মশরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ, আর

নিরালম্ব সূক্ষ্মশরীর অর্থাৎ প্রেতের ওপর নিয়ন্ত্রণ। মহিষাসুর এর কোনটা নিয়ে খেলা করছে এখানে? কী এই স্থির সময়ের মাত্রা, যেখানে আটকা পড়েছে ও?

দূর থেকে ভেসে আসছে মহিষাসুরের হাঃ হাঃ অট্টহাসি। ইন্দ্রিয়গুলো আরও উত্তেজিত হয়ে উঠছে। না, ইন্দ্রিয় নয়, ইন্দ্রিয়ের পরপারে যেতে হবে। সুদীর্ঘ এক শ্বাস নিয়ে চোখ বুজলো দুর্গা। কোমরবন্ধ থেকে টান মেরে বের করে আনলো স্ফটিক-নির্মিত একটি পাত্র, মুখ তার কষে বন্ধ করা আছে কাঠের টুকরো দিয়ে। ছিপি খুলতেই বিশুদ্ধ কোহলের তীব্র গন্ধে নাক জ্বলে গেল। একঢোঁক খেতেই শরীর জুড়ে যেন কোনো এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্রোত বয়ে গেল। চারদিকের এত উত্তেজনা, এত উস্কানি, সব ঝাপসা হয়ে এলো। আর এক ঢোঁক খেলো দুর্গা। কানে এল মহিষাসুরের অট্টহাসি। পাল্টা প্রমত্তের মতো অট্টহাসি হেসে উঠলো দুর্গা। বললো,

'হেসে নে, যত পারিস হেসে নে। যতক্ষণ আমার হাতে এই পানপাত্র আছে, ততক্ষণই তোর জীবন আছে। ততক্ষণ তুই যা পারিস কর।'

মহিষ দেখলো, স্থির সমাহিত দাঁড়িয়ে আছে দুর্গা, যেন কোনো কিছুতেই ওর কিছু আসে যায় না। তূণের শেষ তিরটাও হারিয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো মহিষের বুক। দুর্গার স্থৈর্য ভঙ্গ করতে একটার পর একটা পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলো। নিমীলিত নেত্র দুর্গার একহাতে ভৃঙ্গার, অন্যহাতের খড়্গ। মুহুর্মুহু প্রহারে সেইসব পাথর চূর্ণ করতে লাগলো। হতাশ হয়ে নিরস্ত হলো মহিষাসুর। আরেক ঢোঁক কোহল পান করে স্ফটিকের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিল দুর্গা। চোখ বন্ধ, ইন্দ্রিয় সুপ্ত, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সর্বোচ্চ স্তরে সজাগ। মহিষ দেখলো, দুর্গার কপালের মধ্যিখানে দপ্ করে জ্বলে উঠলো আলোর এক স্ফুলিঙ্গ। দেখতে দেখতে সেই আলো ছড়িয়ে পড়লো ওর দেহ জুড়ে। মহিষ উপলব্ধি করলো, অন্তিম সময় সমাপন্ন। এবার এসবার কী ওসপার।

বাহনে আসীন হয়ে মহিষাসুর শেষবারের মতো সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করলো দুর্গাকে। দিব্যালোকের ঝলকে আলোকিত হয়ে গেল অন্ধকার সুড়ঙ্গ। আয়ুধকলা, মনোদূরসঞ্চালন ও সূক্ষ্মশরীর নিয়ন্ত্রণের একযোগে ব্যবহারে অদ্ভুত এক দ্বৈরথ শুরু হলো। দুর্গার স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর যুগপৎ ক্রিয়াশীল হয়ে মুহুর্মুহু মহিষের প্রতিটি আক্রমণকে ব্যর্থ করতে লাগলো। মানসিক শক্তির প্রয়োগে মহিষ রাশি রাশি অতিকায় প্রস্তরখণ্ড চতুর্দিক থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসে দুর্গার ওপর বর্ষণ করতে লাগলো। দুর্গা পাল্টা মানসিক শক্তির প্রয়োগে সেইসব প্রস্তরখণ্ডকে আকাশেই রেণু রেণু করে ভস্মীভূত করে দিল। প্রতিটি ব্যর্থ আক্রমণের সঙ্গে মহিষ আরও অধৈর্য, আরও মরিয়া হয়ে উঠল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে গেল দুর্গার ওপর। অন্ধ ক্রোধে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিও বিস্মৃত হলো মহিষ। এরকমই এক মুহূর্তে দুর্গার ডানহাত থেকে সূক্ষ্মশরীর নির্মিত এক আলোকচ্ছটা নির্গত হয়ে নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হানলো মহিষাসুরের বাহনের কণ্ঠায়। শিরশ্ছিন্ন হয়ে বাহন এলিয়ে পড়লো মাটিতে। তার নীচে চাপা পড়লো শ্রান্ত মহিষাসুর।

ঝাপসা চোখে মহিষ দেখলো, তেজপ্রভায় দশদিক উদ্ভাসিত করে ওর দিকে ধেয়ে আসছে অতিকায় সিংহে আরোহিণী রক্তবস্ত্র পরিধান এক অসামান্যা তেজস্বিনী নারী। সে নারী অবিকল মাতামহী দনুর মতো দেখতে। মেরুদণ্ড বরাবর তীব্র এক হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল। তীব্র ভয় জাগলো মহিষাসুরের মনে।

'মা! রক্ষা করো মা!!!'

ত্রিশূল হাতে দুর্গা হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মহিষাসুরের ওপর।

একই সঙ্গে ঝাঁপ দিলো চিঙ্কা। শরীর অবশ, আত্মরক্ষার্থে শিথিল হাত উঠেও উঠলো না। চিঙ্কা মহিষের গলা টিপে ধরলো, দুর্গার ত্রিশূল বিদ্ধ করলো মহিষের বক্ষ। চোখের সামনে দিয়ে জীবনের প্রতিটি ঘটনা দ্রুত ছায়াচিত্রের মতো বয়ে গেল মহিষাসুরের। ছোটবেলার ছোটো ছোটো ঘটনা, যেগুলো ও ভুলেই গিয়েছিল, সবাই এসে ভিড় করলো একসঙ্গে। ঠাকুমা দনুর স্নেহ। বরুণ উপজাতিদের সঙ্গে বেড়ে ওঠা। তাদের স্নেহ, ভালোবাসা। তাদের বন্ধুত্ব। অগ্নিদেবের করুণা। পিতা রম্ভকে তিনিই বাঁচিয়েছিলেন অগ্নিপ্রবেশ থেকে। বুকেপিঠে করে মানুষ করেছিলেন বাপ-মা হারা অনাথ ছোট্ট মহিষকে। তার প্রতিদান আমি কীভাবে দিয়েছি?'

ঝাপসা হয়ে এলো চোখ। সময় হয়ে এল। ওপারে কি সত্যিই অসু নামের কেউ প্রতীক্ষা করে আছে? আমি স্বর্গদ্বারে পৌঁছলেই যে আমাকে দিব্যাঙ্গনা বারবণিতাদের উপহারে পুরস্কৃত করবে? সত্যিই কী? আজ আর সেসব বিশ্বাস হচ্ছে না। সবচেয়ে বড়ো কথাটা হলো, দিব্যাঙ্গনাদের আজ আর তেমন আকর্ষণীয় লাগছে না। জগতের কোনো ভোগই আর আকর্ষণীয় লাগছে না। অলীক এক অসুবাদ, তার গাঁজাখুরি গালগল্প ও তার অলীক স্বর্গের মিথ্যে প্রতিশ্রুতিতে ভুলে আমার পরমাত্মীয়দের আমি হত্যা করেছি। ধ্বংস করেছি আমার নিজেরই সমাজ ও সভ্যতাকে। পরকালের স্বর্গের লোভে ইহকালটাকে করে

তুলেছি নরকসদৃশ। শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশবাসীর ইহকাল।

হাত থেকে খড়্গ ও ঢাল খসে পড়লো। শরীরের শেষ শক্তি একজোট করে মহিষাসুর হাতদুটোকে মাথায় ঠেকালো, দুর্গার উদ্দেশ্যে অন্তিম প্রণাম রেখে গেল।

'মা! তোমাকে আমি চিনতে পারিনি। আমি মহাপাপী। স্বর্গ নয়, পরকালের সুখ নয়, যন্ত্রণাময় মৃত্যুই আমার উপযুক্ত পাওনা। মা, জগজ্জননী মা আমার, তোমার এই অধমতম সন্তানকে পারলে ক্ষমা করো মা।'

অন্ধকার দ্রুত ঘনিয়ে এলো দুচোখে। অন্তহীন অন্ধকার...

সময়ের কুজ্ঝটিকা মিলিয়ে গেল বাতাসে। কালী দেখলো, ঘূর্ণির অন্তরাল থেকে ভেসে উঠছে সিংহবাহিনী দুর্গার রক্তস্নাত অবয়ব। পদতলে মর্দিত হচ্ছে সবাহন মহিষাসুর। দূরে কোথা থেকে জানি, ভেসে আসছে ঢাকের বাদ্য।

যুদ্ধ শেষ হলো। তার সঙ্গে সমাপ্ত হলো ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়। হিরণ্যকশিপুর পুত্র বিষ্ণুনিষ্ঠ প্রহ্লাদের প্রভাবে দৈত্যরা আজ অনেকটাই শান্ত। আজকের মূল সমস্যা ছিল দানবদের নিয়ে। কথায় বলে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। নব্য-ধর্মান্তরিত দানবরা দৈত্যদের কাছে নিজেদের অসুনিষ্ঠা প্রমাণ করতে গিয়ে অসুধর্ম প্রচারকে একটা পাগলামির পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল। সেই পাগলামির মূল হোতা ছিল মহিষাসুর। আজ সেই পাগলামির অন্ত হলো। নেতৃত্বহীন দানবরা বেশিদিন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে না। দেশ থেকে দানবাতঙ্ক মুছে গেল। কিন্তু তবু দুর্গার মন আজ ভারাক্রান্ত। বারবার মনে হচ্ছে, অনেক গুণও তো ছিল মহিষাসুরের। কুশলী যোদ্ধা, সফল সেনানায়ক। পরাবিদ্যায় দক্ষ। কুশল প্রশাসক। সামান্য এক মহিষ-উপজাতিকে সম্বল করে দেশব্যাপী সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল। আগামী যুগে একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? এত ক্ষমতা, জগতের কত মঙ্গলে লাগতে পারতো। এত গুণের মধ্যে একটা দোষ সবকিছু নষ্ট করে দিল। নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই ছিল ওর কাছে সবকিছু। মহিষাসুর ভুলে গিয়েছিল ভারতবর্ষের রাজনীতির শাশ্বত সত্যটা। এদেশে রাজনীতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যম নয়, রাজনীতি স্বর্গে যাওয়ার সিঁড়িও নয়। এদেশে রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, দীন-দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণ। দুর্গা দেখলো, আনন্দে মেতে উঠেছে চামুণ্ডাবাহিনী। দানবদের রক্ত দিয়ে হোলিখেলা খেলছে। পাগলের মতো হা-হা করে হাসছে। ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। দানবদের ছিন্নমুণ্ড দিয়ে লোফালুফি করছে। দুর্গা একবার ভাবলো, ওদের এসব করতে বারণ করবে। শত্রু যেই হোক, মৃত্যুর পর তার দেহকে অসম্মান করার অধিকার কারোর নেই। তারপর ভাবলো, এই মেয়েরা কী অকথ্য অত্যাচারই না সহ্য করেছে। আজ এরা নিজেদের হাতে সেই অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। প্রতীকী হলেও সেই মুক্তির উপলব্ধিকে উদ্‌যাপন করতে দিতে হবে।

ঠিক সামনে শ্যামলাবরণ একটি মেয়ে আগুন হাতে নিয়ে উন্মত্তের মতো নাচছিল। দুর্গা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির কপালে গালে আলতো করে ছোঁয়ালো নিজের রক্তস্নাত হাতদুটো। অবাক হয়ে দুর্গার দিকে চোখ তুলে চাইলো মেয়েটি। তারপর আগুনের মালসা ফেলে দিয়ে দুর্গার হাতদুটো নিজের গালে চেপে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে উঠলো।

'ভালো থাকিস, মেয়ে!' বললো দুর্গা, 'দুঃস্বপ্ন শেষ হয়েছে। এখন আর দুঃস্বপ্নের স্মৃতি বয়ে বেড়াস না।'

হাঁটু গেড়ে দুর্গার পা-দুটো জড়িয়ে ধরলো মেয়েটি। চোখের জলে ধুইয়ে দিল দুর্গার রাঙা চরণযুগল।

তান্ত্রিক পদ্ধতিতে দীর্ঘ এক প্রহরের প্রচেষ্টায় মহিষাসুরকে বাঁচিয়ে তুললো কালী। চোখ মেলে শয্যাপার্শ্বে দুর্গাকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে গেল। তারা ওকে জোর করে শুইয়ে দিল। দু-চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু বয়ে চলেছে, ডুকরে কেঁদে উঠলো বিশ্বত্রাস দানব। দু-হাত জড়ো করে দুর্গাকে বললো,

'যে সত্য তুমি রক্তবীজকে দেখিয়েছিলে, সেই সত্য আমিও দেখে এলাম। মাগো, সারাজীবন আমি শুধু ভুলের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরেছি। জঘন্য পাপী আমি। আমার জীবনটাই ব্যর্থ। কী করে এই পাহাড়প্রমাণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করবো, জানি না।'

'ভুল তো তুই সত্যিই করেছিস', বললো দুর্গা, 'আর সে ভুলের খেসারত দিচ্ছে গোটা দেশ। কিন্তু আজ এই যে তোর মনে প্রায়শ্চিত্তের ইচ্ছে জেগেছে, এতেই আমি খুশি।'

'বাঁচার আর কোনো ইচ্ছে নেই আমার। এই জীবনটা নিয়ে

KALI PIGMENTS PVT. LTD.

Manufacturers of Red Lead, Litharge & Lead Sub-Oxide

1/4C, Khagendra Chatterjee Road
Kolkata - 700 002, W.B. India
Mobile : 98367 98663, Email : rinku_kej@yahoo.com
E-mail : kamal.kishore64@yahoo.com

Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees

160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor,
Kolkata-700 007 (s) 2272-5487
Mob : 9331105467

আমি কী করবো, বলে দাও মা।'

'সেটাই তোকে বলছি, শোন। এই দেশে তোর থাকা আর ঠিক নয়। যদি তুই মারা যাস, তবে তোকে শহিদ বানিয়ে নতুন করে রাজনীতি শুরু হবে। শোনা যাচ্ছে তোর স্ত্রী মহিষী সেই চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। সেটা হতে দেওয়া যায় না। আর যদি তুই জীবিত অবস্থায় এই দেশে থেকে যাস, তাহলে তোকে ঘিরে দানবরা আবার দল বাঁধবার চেষ্টা করবে। ওদের চাপে পড়ে তোরও মতিভ্রম হতে পারে আবার। আমি চাই, পরাজিত দানবরা দেশের সাধারণ জনগণের সঙ্গে মিশে যাক। দানব বলে তাদের আলাদা কোনো পরিচয় যেন আর না থাকে এদেশে। আর তারই স্বার্থে তোকে নির্বাসনে যেতে হবে। কমলার বাণিজ্যপোত পশ্চিমে রোমকপুরী পর্যন্ত যায়। ওর নাবিকরা বলেছে, রোমকপুরীর উত্তরে এক মনুষ্যবিহীন শস্যশ্যামল দেশ আছে। সেটাই নাকি পৃথিবীর উত্তর সীমান্ত। ব্রঙ্গার নৌসেনার প্রহরায় কমলার বাণিজ্যপোত তোকে আর তোর অনুগামীদের সেখানে পৌঁছে দেবে। সেখানে নতুন করে বসতি স্থাপন করিস। এদেশে ফেরার চেষ্টা কখনো করিস না। সে চেষ্টা করলে পরিণাম ভয়ংকর হবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই রে। আমি কিন্তু নজর রাখবো তোর ওপর। তবে দুঃখ পাস না। জেনে রাখিস, যতকাল এ দেশের মানুষ আমাকে মনে রাখবে, ততকাল ওরা তোকেও মনে রাখবে।'

'তুমি যা চাও, তাই হবে মা', অশ্রুসজল কণ্ঠে বললো মহিষ, 'আমার এ জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

মাতৃভূমিকে শেষ বিদায় জানিয়ে জীবিত অবশিষ্ট অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে অর্ণবপোতে চাপলো মহিষ। দীর্ঘ ছ-মাস সমুদ্রযাত্রার পর অর্ণবপোত পৌঁছলো নবীন এক উপকূলে। সেখান থেকে শুরু হলো পায়ে হাঁটা। ছ-দিন পথ চলার পর মহিষাসরকে স্বাগত জানালো দু'কূল ছাপানো বিশাল এক নদী। সেই নদীর জলে নেমে আজ বহুকাল পরে বরুণমন্ত্রে স্রোতস্বিনীর আরাধনা করলো মহিষ। গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করলো মাতামহী দনুর উদ্দেশ্যে। মনে হলো যেন ঘরে ফিরল। নদীর স্রোতে শরীর ভাসিয়ে শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কাঁদলো বহুক্ষণ।

'এই নদী পুণ্যতোয়া, জীবনদায়িনী। এর উপকূলেই আমরা ঘর বাঁধবো।' ভেজা গলায় বললো মহিষাসুর।

'কী নাম হবে এই নদীর?' প্রশ্ন করলো অনুচর কৃষাঙ্গ। মহিষ বোধহয় নিজের নামে নাম রাখবে নদীর, ভেবেছিল কৃষাঙ্গ। ওকে অবাক করে দিয়ে মহিষ বললো, 'মাতামহী দনুর নামে এর নাম দিলাম— দন্যুব।'

মহিষাসুর মর্দন ও নির্বাসনের পর বহু সহস্রাব্দ পার হয়ে গেছে। ইউরোপের প্রধান নদী পুণ্যতোয়া দন্যুব আজও বয়ে চলেছে। সেই নদীর পাড়ের অধিবাসীরা আজও উৎসবের দিনে মহিষাসুরের মতোই শিংওলা মুকুট পরে। কালান্তরে মহিষের জনজাতি ছড়িয়ে পড়েছে সারা ইউরোপ জুড়ে। কিন্তু যেখানেই তারা গেছে, সেখানকার নদীর নাম তারা রেখেছে মাতামহী দনুরই নামে। ইউরোপের পশ্চিমসীমান্তে দন্যুর থেকে পূর্ব সীমান্তে দন এবং তাদের মধ্যবর্তী অজস্র নদী, সবাই আজও বয়ে চলেছে জল-উপাসিকা মাতামহী দনুরই নাম বুকে ধরে।

আর আমরা?

আমরা আজও দুর্গোৎসবে সিংহবাহিনীর আরাধনা করি। স্মরণ করি অসামান্যা এক মানবীকে, যিনি স্বীয় শক্তিতে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়েছিলেন। তাঁর মনীষার প্রতি সম্মানে আজও মহাবলাচল পর্বত শ্রদ্ধাবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে মহীশূর নগীরর ঠিক মধ্যিখানে। লোকে তাকে 'চামুণ্ডি পর্বত' বলে। জম্বুদ্বীপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শরৎকালে ঢাক বাজে সেই মহামানবীর সংগ্রামের স্মৃতিতে। কিন্তু কোথাও কোথাও সে ঢাক আজ আর বাজে না। কারণ, দুর্গোৎসবের পেছনে লুকিয়ে থাকা অসুরদের জন্মকথা আমরা ভুলে গেছি। যারা ইতিহাসকে ভুলে যায়, তারা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। যারা রক্তবীজদের ভুলে যায়, তারা রক্তবীজদের জন্ম দেয়।

মহাবলাচলের যুদ্ধের পরেও বহুকাল পর্যন্ত অসুররা উৎপাত চালিয়ে গিয়েছিল। শেষমেশ দুর্গার ছেলে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় অবশিষ্ট অসুরদের তাড়িয়ে হিমালয়ের পশ্চিমপারে পাঠিয়ে দেন। কার্তিকেয়র যে বাহিনী অসুরদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের বংশধাররা আজও আছে। বসবাস তাদের মধ্যপ্রাচ্যে, সিঞ্জর পর্বতের চূড়ায়। কার্তিকবাহন ময়ূরের উপাসক সেই উপজাতিকে লোকে বর্তমানে 'ইয়েজিদি' নামে চেনে। পলাতক অসুররা হিমালয়ের পশ্চিমবাহু জুড়ে ও তার পরপারে এক বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল। সেই অসুর-সভ্যতা এককালে মধ্যপ্রাচ্যের সীমানা ছাড়িয়ে ইউরোপ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল।

অসুর বাণীপালের নামে কাঁপতো ধরাধাম। আজ তারা প্রায় বিলুপ্ত। হালে আইসিসের অত্যাচারে অসুরদের শেষ

বংশধররাও বিতাড়িত হয়েছে প্রাচ্যভূমি থেকে। অথচ আমরা আজও এখানে রয়েছি। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে একমাত্র আমরাই টিকে আছি। সভ্যতার এই অমরত্বের রসহ্যটা কী? সেদিন যদি মা দুর্গা অসুরনিধন না করতেন, তবে ভারতীয় সমাজ কেমন হতো? সোসাইটি ক্রিয়েটস হোয়াট ইট রিওয়ার্ডস।

আসুরিক, রাজশক্তি-কেন্দ্রিক, ‘জোর যার মুলুক তার’ নীতি যদি সেদিন ভারতে স্বীকৃতি পেয়ে যেত, তাহলে আর সব প্রাচীন সমাজের মতোই এদেশেরও রাজশক্তি-মুখপেক্ষী জো-হুজুর কর্তাভজা সমাজ গড়ে উঠতো। যে সমাজে লোকশক্তির কোনো ভূমিকা থাকতো না। কোনো বিদেশি শক্তি যদি রাজাকে হারিয়ে দিত, প্রজারা অমনি আক্রমণকারীর বশংবদ হয়ে যেত। অসুরদেরই দশা হতো আমাদের। সেটা যে হয়নি, তার জন্য আমরা মায়ের কছেই ঋণী। মা দুর্গা পরা ও অপরা, উভয় শক্তির আকর। তিনি বৎসলময়ী, সমাজের মাতৃস্বরূপা। মা আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে শিখিয়েছেন। সত্যপথে অবিচল থাকতে শিখিয়েছেন। মা দুর্গা যোগমায়া, শক্তিস্বরূপিণী। তিনি তাঁর সেই শক্তির অনন্ত ভাণ্ডার গচ্ছিত রেখে গেছেন ভারতবর্ষের প্রতিটি নারীর মধ্যে। বহুকাল প্রায়সুপ্ত ছিল সেই মাতৃশক্তি। আজ আবার তার জাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত। সেই আদ্যাশক্তির পরা ও অপরাশক্তির যুগপৎ জাগরণের প্রতীক্ষায় রইলাম। জাগবে, সে নিশ্চয়ই জাগবে। দশদিক আলো করে জেগে উঠবে মাতৃশক্তি। তবেই নিশ্চিত হবে এ জগৎ সংসার।